অক্টোবর ২০২৪ ❑ আশ্বিন-কার্তিক ১৪৩১

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

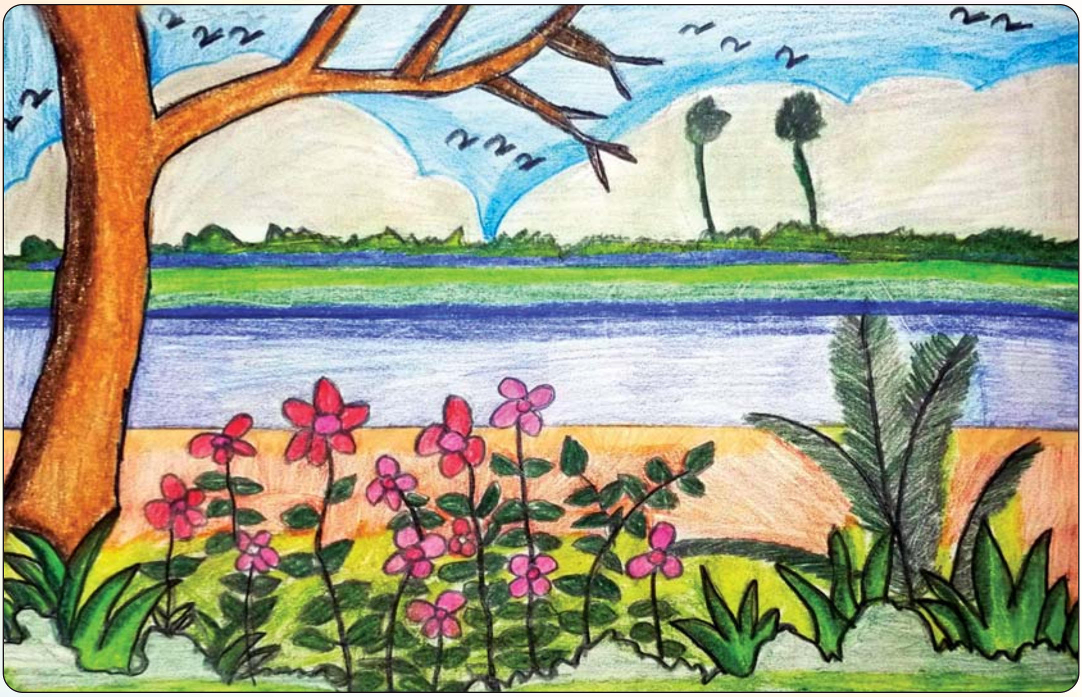

দ্বীন মোহাম্মদ, সপ্তম শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

সামিহা জামান অদ্রি, পঞ্চম শ্রেণি, কে. এল. জুবলী স্কুল ও কলেজ, ঢাকা

সম্পাদকীয়

প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার পালিত হয় ‘বিশ্ব শিশু দিবস’। সেই হিসেবে এ বছর ৭ই অক্টোবর ‘বিশ্ব শিশু দিবস’। শিশুদের সম্মানে সরকারি-বেসরকারিভাবে নানা আয়োজনে দেশব্যাপী এ দিনটি পালিত হয়। আজ যারা শিশু, আগামীতে তারাই হবে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার। তারা যাতে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে, সে জন্য শিশুদের উন্নয়নে সবাইকে হাতে হাত রেখে কাজ করতে হবে। তোমাদের জানাই বিশ্ব শিশু দিবসের শুভেচ্ছা।

বাংলাদেশে আরো এক ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের সূচনা ঘটে এ বছরের জুলাই মাসে। সেই সময়কে স্মরণ করে এবারের নবারুণেও রাখা হয়েছে নিবন্ধ, গল্প ও কবিতা। কোটা সংস্কারের শান্তিপূর্ণ দাবি থেকে শুরু হওয়া আন্দোলনটি পরবর্তীতে ছাত্র-জনতার গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ‘বাংলা ব্লকেড’ নামে দেশব্যাপী অবরোধ কর্মসূচি দেয়। এ সময় পুলিশের গুলিতে রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদের মৃত্যু হলে আন্দোলন আরো তীব্র হয়। অবশেষে বাংলাদেশে একটি নতুন যুগের সূচনা হয়, যা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ভালো থেকো তোমরা, নবারুণের সাথেই থেকো।

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৭০২

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
রিফাত জাফরীন

সম্পাদক
ইসরাত জাহান

সিনিয়র সহসম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহসম্পাদক
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
মেজবাউল হক

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

সূচি

নিবন্ধ

০৩ বিশ্ব শিশু দিবস/ জায়েদুল আলম
০৮ আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস/ জান্নাতে রোজী
১১ অন্যরকম গল্প/ আব্দুল্লাহ শামিল
১৫ জুলাই আন্দোলন কী করে হলো/ মো. সিরাজুল ইসলাম
৪৯ শমসের গাজীর সুড়ঙ্গ/ তৌহিদুল আলম
৬০ বুদ্ধিতে ধার দাও/ নাদিম মজিদ

গল্প

২২ হামার বেটাক মারল কেনে/ নাসীমুল বারী
২৬ আমি আনাস বলছি/ কামাল হোসাইন
৩০ দেয়ালের ছবি/ পল্লব শাহরিয়ার
৩২ মায়া ও মুক্তি/ রহিমা আক্তার মৌ
৩৮ বাবার অপেক্ষায়/ সালাম ফারুক
৪১ মেঘ, পাখি আর ঘুড়িটি/ খায়রুল বাবুই
৪৪ জাদুর পেনসিল/ আজহার মাহমুদ

প্রতিবেদন

৫১ সর্বকনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক মাস্টার মনন
শাহানা আফরোজ
৫২ আঠারো বছরে ১৪ পর্বত জয়/ জহিরুল ইসলাম
৫৩ শিশুর জলবসন্ত/ মো. জামাল উদ্দিন
৫৪ হোমলেস বিশ্বকাপে বাংলাদেশ
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
৫৬ আবু সাঈদের প্রতিকৃতি/ সানজিদ হোসেন শুভ
৫৭ শিশুর আচরণে নানা রহস্য/ মেজবাউল হক
৫৮ দশদিগন্ত/ সাদিয়া ইফফাত আঁখি

কবিতাগুচ্ছ

১০ গোলাম নবী পান্না
১৪ জিশান মাহমুদ
২১ মো. মনির হোসেন/ আরিফুল ইসলাম

সায়েন্স ফিকশন

৪৬ কম্পিরাস/ আশরাফ পিন্টু

ছোটোদের ছড়া

১০ আবির আহমেদ/ সাদেকুর রহমান
৪৮ তানভির আহমেদ

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : দ্বীন মোহাম্মদ/ সামিহা জামান অদ্রি
তৃতীয় প্রচ্ছদ : সাদিয়া হোসেন মিম
মীর্জা মাহের আসেফ
শেষ প্রচ্ছদ : আফনান তারীফ আহমেদ
৪৩ সামিকা নূর ইমি
৬১ নুরুন নাহার মীম
৬২ রাফিন আল রাজি/ দীপায়ন অধিকারী
৬৩ তাহমিদ আজমাঈন আহনাফ/ শাহারিয়া বারী
৬৪ নাভিন আল রাজী/ ইশরাত ইয়াছিন ইরা

নবারুণ পত্রিকা পড়া ও ডাউনলোড করা যাবে

Nobarun Potrika

www.dfp.gov.bd

বিশ্ব শিশু দিবস

জায়েদুল আলম

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তারাই আগামী দিনের উজ্জ্বল বার্তা বয়ে আনে। তাদের মধ্যে সুপ্ত হয়ে থাকে আগামী দিনের পৃথিবীর স্বপ্ন- কল্পনার সম্ভাবনার নতুন ইতিহাস। আজ যারা নবজাতক, যারা হাঁটি হাঁটি পা-পা করে পৃথিবীর বুকে নতুন পদচারণা শুরু করছে, তাদের কথা আমাদের ভাবতে হবে । অনাগত আগামী দিনে তারাই শৈশব-কৈশোরের কিশলয় দশা ঘুঁচিয়ে পূর্ণ পরিণত হবে যৌবনের শ্যামল গৌরবে। সেদিন তাদের হাতে থাকবে সারা বিশ্বের নিয়ন্ত্রণশক্তি। আজকের নবজাতকদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে আগামী দিনের শিল্পী, কবি-সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী দার্শনিক ও স্বদেশপ্রাণ মহাপুরুষ। তাই সমাজ ও মানুষের কর্তব্য শিশুদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া, তাদের স্বাধীন ও আত্মপ্রকাশের পথ খুলে দেওয়া। একদিন শিশুরাই হবে দেশের কর্ণধার। কবি গোলাম মোস্তফা বলেছেন, 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে'। কাজেই বিশ্ব শিশু দিবসের গুরুত্ব অনেক।

বিশ্ব শিশু দিবস একটি স্মরণীয় দিন । যা শিশুদের সম্মানে প্রতি বছর উদযাপিত হয়। এটি উদযাপনের তারিখ দেশ অনুসারে পরিবর্তিত হয়। ১৯২৫ সালে জেনেভায় বিশ্ব শিশু কল্যাণ সম্মেলনে প্রথম আন্তর্জাতিক শিশু দিবস ঘোষণা করা হয়। ১৯৫০ সাল থেকে এটি বেশিরভাগ কমিউনিস্ট এবং পোস্ট-কমিউনিস্ট দেশগুলোতে ১লা জুন উদ্‌যাপিত হয়। ১৯৫৯ সালের ২০শে নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক শিশু অধিকারের ঘোষণাকে স্মরণ করার জন্য ২০শে নভেম্বর বিশ্ব শিশু দিবস পালন করা হয়। কিছু দেশে, এটি শিশু সপ্তাহ হিসেবে পালিত হয়।

স্মরণ করা যেতে পারে, যোগ্যম্যাসাচুসেটসের চেলসিতে ইউনিভার্সালিস্ট চার্চ অফ দ্য রিডিমারের যাজক রিভারেন্ড ডা. চার্লস লিওনার্ড ১৮৫৭ সালের জুন মাসের দ্বিতীয় রবিবার শিশু দিবস পালন শুরু করেন। লিওনার্ড তাদের এবং শিশুদের জন্য উৎসর্গকৃত একটি বিশেষ সেবার আয়োজন করেন। লিওনার্ড প্রথমে দিনটির নামকরণ করেন রোজ ডে, যদিও পরে ফ্লাওয়ার সানডে নামকরণ করা হয় এবং এরপরে শিশু দিবস হিসেবে নামকরণ করা হয়।

বিশ্ব শিশু দিবস বাংলাদেশে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতি বছর নিয়মিত পালিত হয়। সারা বিশ্বের প্রায় ১২৪ টি দেশে প্রতি বছর এইদিনে দিবসটি পালন করে থাকে। বাংলাদেশও তার মধ্যে একটি। ১৯৪৪ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 'শিশু অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা' গ্রহণের মাধ্যমে শিশুদের অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ 'বিশ্ব মানবাধিকার সনদ' গ্রহণ করে, যার আওতায় শিশুদের অধিকার সন্নিবেশিত হয়। এরপর ১৯৮৯ সালের ২০শে নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে 'শিশু অধিকার সনদ' সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। এতে শিশুদের চাহিদা ও অধিকারের প্রতিফলন ঘটে। বাংলাদেশে ১৯৯০ সালের ২রা সেপ্টেম্বর থেকে সনদের কার্যকারিতা শুরু হয়। এতে শিশুদের বয়স ১৮ বছর পর্যন্ত নির্ধারিত আছে। এই সনদের মধ্য দিয়ে সারাবিশ্বের মানুষ শিশুদের জন্যে ১০টি অধিকার স্বীকার করে নেয়। প্রতিবছর শিশু দিবস পালনের মধ্য দিয়ে সেসব অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মানুষের মধ্যে সার্বিক চেতনা সৃষ্টিই এ দিবসটি উদযাপনের আসল উদ্দেশ্য।

তৃতীয় বিশ্বের একটি অনুন্নত জনবহুল দেশ বাংলাদেশ। এদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। এর মধ্যে শিশু-কিশোরের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০ ভাগের বয়স ৫ বছরের কম।

প্রতি বছর সারা বিশ্বে অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব শিশু দিবস হিসেবে পালিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশেও যথানিয়মে দিবসটি পালিত হয়। শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য-সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ অধিকার ও উন্নয়ন ভাবনার জন্য এই দিনটি নির্ধারিত। তাই বিশ্বের সকল শিশুর জন্য এই দিনটির তাৎপর্য অপরিসীম। 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।' অর্থাৎ আজকে যে শিশু, সে-ই একদিন পরিপূর্ণ মানুষ হবে। আর এই পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার জন্য শিশুর চাই কতগুলো জিনিস। যেগুলো শিশুর পক্ষে একা কখনোই অর্জন করা সম্ভব নয়।

শিশুর এই গড়ে ওঠার সর্বোত্তম সময়টি হচ্ছে শৈশব। শৈশবে যদি শিক্ষা থেকে কেউ বঞ্চিত হয়, যদি কেউ উপযুক্ত খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হয়, যদি কেউ ভালোবাসা ও নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে কী হবে? ভবিষ্যতে সমাজ একজন অশিক্ষিত, দুর্বল স্বাস্থ্যের, আত্মবিশ্বাসহীন, কখনো কখনো নিষ্ঠুর প্রকৃতির একজন নাগরিক পাবে। বিপরীতভাবে বললে সমাজ একজন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, সুশিক্ষিত আত্মবিশ্বাসী ও সৃজনশীল প্রকৃতির একজন মানুষকে হারাবে। সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে সে হয়ত অনেক কিছুই করতে পারত। এ জন্য শৈশব এত গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, প্রথম মহাযুদ্ধে মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হলে ১৯২৪ সালে লিগ অব নেশনস্ প্রথম শিশু অধিকারের ওপর জেনেভা কনভেনশন ঘোষণা গ্রহণ করে। অবশ্য এর আগে শিশু অধিকার সম্পর্কে বহু দেশে অনেক আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ভেঙে যায় লিগ অব নেশনস। জাতিসংঘ ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সালে আন্তর্জাতিক

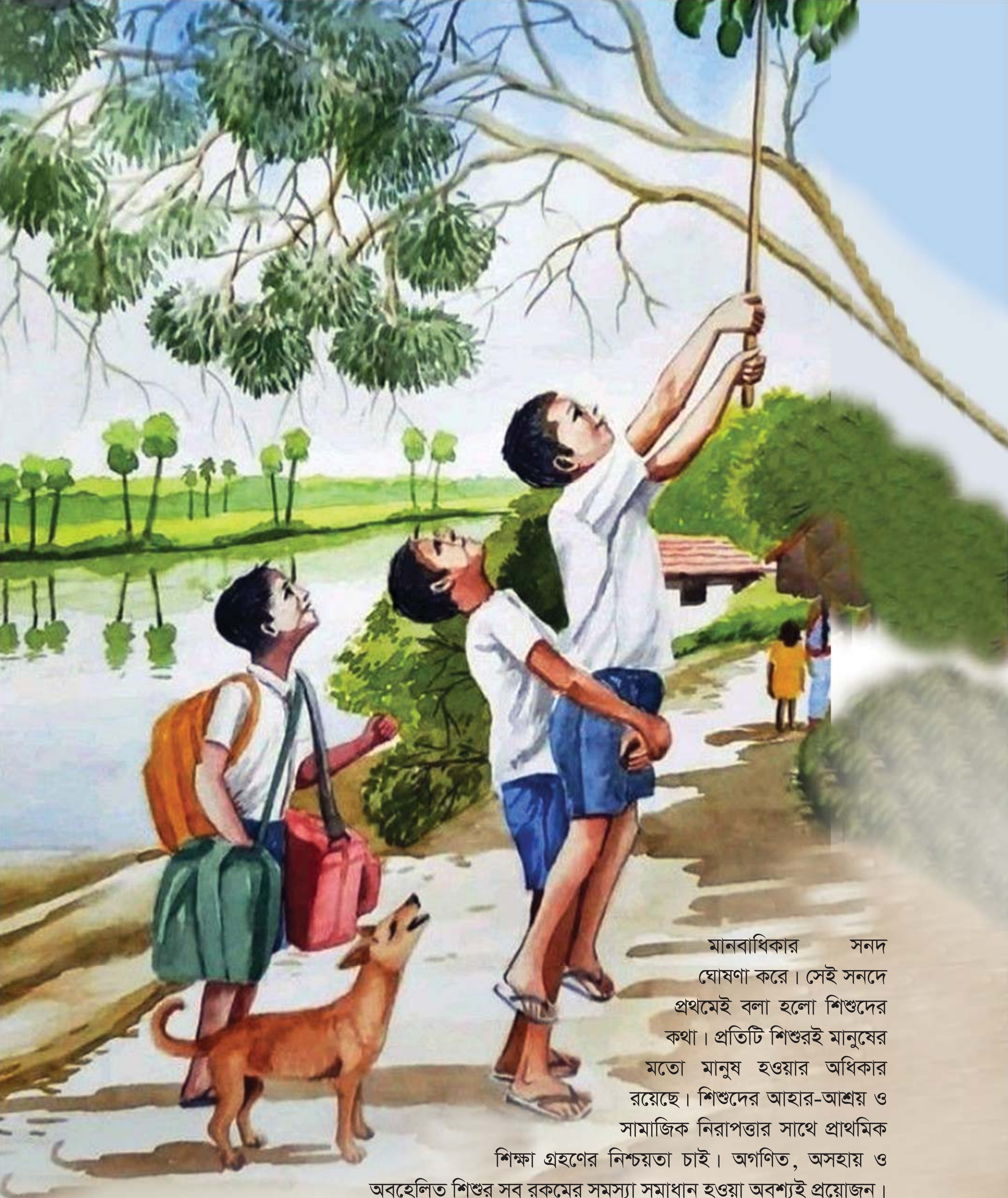

মানবাধিকার সনদ ঘোষণা করে। সেই সনদে প্রথমেই বলা হলো শিশুদের কথা। প্রতিটি শিশুরই মানুষের মতো মানুষ হওয়ার অধিকার রয়েছে। শিশুদের আহার-আশ্রয় ও সামাজিক নিরাপত্তার সাথে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের নিশ্চয়তা চাই। অগণিত, অসহায় ও অবহেলিত শিশুর সব রকমের সমস্যা সমাধান হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। জাতিসংঘ ঘোষিত এই সনদে শিশুর বেশ কয়েকটি মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, শিশুদের এই

অক্টোবর বিশ্বের ৪০টি দেশ প্রথম বিশ্ব শিশু দিবস উদযাপন করে। ১৯৫৯ সালের ২০শে নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ গ্রহণ করে শিশু অধিকার ঘোষণা। এই ঘোষণা তখন জাতিসংঘের ৭৮টি দেশ গ্রহণ করে। ফলে সময়ের সাথে সাথে শিশু অধিকারের প্রয়োজনীয়তাও বেড়েছে। ১৯৮৯ সালের ২০শে নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ আবার গ্রহণ করে শিশু অধিকার সনদ। তখন জাতিসংঘের সদস্যসংখ্যা ছিল ১৬০টি। শিশু অধিকার সনদে সংযুক্ত ৫৪টি ধারা সম্পর্কে দশ বছর ধরে আলোচনার পরই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এই সনদ। এতে ১৮ বছর পর্যন্ত সব ছেলেমেয়েকে শিশু-কিশোর হিসেবে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ

মৌলিক অধিকারগুলোর সাথে বিশ্বের সমাজসচেতন মানুষ একাত্মতা প্রকাশ করেন। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নাগরিকদের নিরাপত্তার প্রয়োজন অনুভব করেন। এ লক্ষ্যেই গঠন করা হয় আন্তর্জাতিক শিশুকল্যাণ ইউনিয়ন (ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার বা ইউনিসেফ) ১৯৫২ সালে বিশ্বব্যাপী শিশু দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয় ইউনিসেফ।

দিনটি পালনের জন্য নির্ধারিত হয় অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার। উল্লেখ্য, ১৯৫৩ সালের ৫ই

পূর্ণবয়স্ক হয়ে ওঠার আগ পর্যন্ত সবাই শিশুদের এই বিশেষ অধিকারগুলো ভোগ করতে পারবে। এই সনদ অনুমোদনকারী ২২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ১৯৯০ সালে শিশু অধিকার সনদ সারা বিশ্বে চালু হওয়ার পর প্রতি বছর ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন করা হয়। তাই সারা বিশ্বে শিশু অধিকার বিষয়টি আজ ব্যাপকভাবে আলোচিত। আজকের শিশু আগামী দিনের আলোকিত পৃথিবী গড়ার কারিগর। আজকের শিশু একদিন পৃথিবীকে চালিত করবে। আমাদের সব শিশু সমানভাবে সুযোগ

সুবিধা পায় না। বড়ো হওয়ার সুন্দর পরিবেশ অনেক শিশুরই নেই, সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার পথে নানান বাধাবিঘ্নতা, অনেক শিশু ফোটার আগেই কুঁড়িতেই ঝরে যায়। ফুল হয়ে বিকশিত হয়ে সৌরভ ছড়াতে পারে না। অনেক মায়ের সন্তান ভালোভাবে বড়ো হওয়ার সুযোগ পায় না। সুন্দর পরিবেশে বেড়ে ওঠা অনেকের ভাগ্যে জুটে না। শিশু অধিকারের প্রতি একটু সচেতনতা, পৃষ্ঠপোষকতা আমাদের শিশুর সুস্থ পরিবেশে বেড়ে ওঠায় সহায়ক হতে পারে। শিশুদের মুক্তমনের বিকাশের অভিভাবক ও শিক্ষকদের অধিক সচেতন হতে হবে। শিশুর মেধা মনন সৃজনশীলতা বিকাশে ভালো বই তার হাতে তুলে দিতে হবে। বাবা-মার অসচেতনতার দরুন শিশুমনের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। শিশুর মন কল্পনাপ্রবণ, কত কিছু করতে চায়। তার কল্পনাশক্তির বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করে দিতে হবে। গল্প, ইতিহাস, ঐতিহ্য, জীবনীবিষয়ক বই তাকে পড়তে দিতে হবে, যাতে করে তারা আলোকিত মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে। প্রত্যেক শিশুই কিছু অধিকার নিয়ে জন্মায়। শিশুর সেই অধিকার প্রাপ্তিতে বাধার সৃষ্টি হলে শিশুর প্রতিভা বিকাশের পথ অবরুদ্ধ হয়ে যায়। তাই শিশুর অধিকার ও নিরাপত্তার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশু অধিকারের মধ্যে প্রধান হলো শিক্ষা, মুক্তমনের বিকাশের সহায়তা, খেলাধুলা, কাজ করার স্বাধীনতা ও জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সহায়তা। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক বহু সংস্থা শিশুর সুন্দর পরিবেশে বেড়ে ওঠার বিষয়ে তথা শিশু অধিকার নিয়ে কাজ করছে। শিশুকে ফুলের মতো বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়ার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের বহু সংস্থা ও ব্যক্তি। অবশ্য, শিক্ষাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার প্রতি আমাদের সরকার যথেষ্ট মনোযোগী, নানাবিধ সুযোগ দিয়ে শিশুদের স্কুলমুখী করার ব্যাপারে সরকারের উদ্যোগের কমতি নেই। শিশুদেরকে শুধু লেখাপড়ার চাপে না রেখে সময় সময় তাদের ইচ্ছেমতো কিছু করতে দেয়া উচিত। শিশুর নিজস্ব একটা কল্পনার জগৎ আছে, তাকে অন্তত কিছু সময়ের জন্য তার জগতে পদচারণায় সুযোগ দিতে হবে। শিশুমনের ঘরের দরজা খুলে দেয়া সব অভিভাবকেরই কর্তব্য। এতে করে শিশুর মৌলিক মনের বিকাশের সহায়ক হয়। পড়ালেখা, খেলাধুলা যেমন অধিকার, তেমনি টেলিভিশনে কার্টুন বা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখাও শিশুর অধিকার, এ অধিকারে বাধা দেয়া মানে তার মনে কষ্ট দেয়া। এতে করে শিশুর মনের বিকাশে বিঘ্ন ঘটে। শিশুরা কোমলমতি, শিশুমন বড়ো স্পর্শকাতর, শিশু মনের বিকাশে স্নেহ -মমতাকে বেশি প্রাধান্য দিতে হবে।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। আর শিশু দেশ ও মানবজাতির ভবিষ্যৎ। কাজেই শিশু সমাজকে অবহেলিত রাখার অর্থই হচ্ছে দেশ এবং সমগ্র মানবজাতিকে অবহেলা করা, অবজ্ঞা করা। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে শিশুদের জন্য সরকারিভাবে শিশুকল্যাণ তহবিল রয়েছে। এ তহবিলের সাহায্যে লেখাপড়া শিখিয়ে শিশুদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা হয়। এসব উন্নত দেশে শিশুদের জন্য বেসরকারিভাবেও বহু সংগঠন রয়েছে। তারা অনেক শিশুর লালনপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর কবিতায় আহ্বান জানিয়েছেন এভাবে- 'এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি, নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।'

তাই শিশুদের প্রতি আমাদের অবজ্ঞার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে সহানুভূতিশীল হতে হবে। তাদের পুষ্টি, বৃদ্ধি, পরিণতি, শরীর-মনে স্বাচ্ছন্দ্য স্বাভাবিক সুষ্ঠু বিকাশে আমাদের সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির অনুশীলন করতে হবে। দেশে ব্যাপকভাবে বিশ্ব শিশু দিবস পালন করা হলে অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত শিশুদের কথা সকলে জানতে পারবেন। এতে অনেক দয়ালু ব্যক্তির হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হবে এবং তারা অসহায় শিশুর অবস্থার উন্নয়নের জন্য অনেকেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। তখনই সফল হবে বিশ্ব শিশু দিবসের প্রকৃত উদ্দেশ্য। আর শিশুর প্রাপ্য অধিকারের প্রতি সবাই সচেতন হতে পারলে শিশুর মেধা, মনন, সৃজনশীলতা বিকাশ তথা শিশুর প্রতিভা বিকাশ সহায়ক হবে। ❑

শিক্ষাবিদ ও গবেষক

আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস

জান্নাতে রোজী

বিশ্বজুড়ে জাতিসংঘভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ প্রতিবছর ১১ই অক্টোবর পালন করে আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস। এরই অংশ হিসেবে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও ১১ই অক্টোবর উদযাপিত হয় আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য, 'কন্যাদের চোখে আগামী'। এ উপলক্ষে দেশের সরকারি -বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে।

কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে ঢাকায় যৌথভাবে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) ও প্রথম আলো ডটকম। অনুষ্ঠানে 'কথা হোক, বাবা -মেয়ের চিঠি' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

ইউএনএফপিএ পরিচালিত একটি প্রচারাভিযান হচ্ছে 'সেলিব্রিটিং ডটার্স'। ২০২২ সাল থেকে 'আমার মেয়ে আমার আগামী' স্লোগানে শুরু এ প্রচারাভিযানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, নারী ও মেয়েদের সঠিক মূল্যায়ন এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মেয়েদের অবদানের স্বীকৃতি ও উদযাপন।

২০২৩ সালের শেষদিকে এ প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে প্রথম আলো ডটকমের সহযোগিতায় 'কথা হোক' নামে এক চিঠি লেখার উদ্যোগ নেয় ইউএনএফপিএ। ২০২৪ সালের মার্চের মধ্যে প্রচারাভিযানটি প্রায় ৮৪ লাখ অনলাইন ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছায়। প্রায় ১৬ লাখ পাঠক জানতে পারেন চিঠি লেখার এই আয়োজনের কথা। এরপর সারাদেশ থেকে আসা তিন শতাধিক চিঠি থেকে ২৯টি চিঠি নিয়ে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় 'কথা হোক, বাবা-মেয়ের চিঠি' শিরোনামে বই প্রকাশ করা হয়।

এ বইয়ে ২৯ টি চিঠি স্থান পেয়েছে। বাবা ও মেয়ের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, হারানোর বেদনা, মানুষ হয়ে গড়ে উঠার প্রত্যাশা, এমনকি অভিমান ও ক্ষোভ উঠে এসেছে এসব চিঠিতে।

উল্লেখ্য, ২০১২ সালের ১১ই অক্টোবর প্রথম কন্যা শিশু দিবস দিবস পালন করা হয়েছিল। লিঙ্গ বৈষম্য দূর করাই এই দিবসের অন্যতম উদ্দেশ্য। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রসমূহ হল শিক্ষার অধিকার,

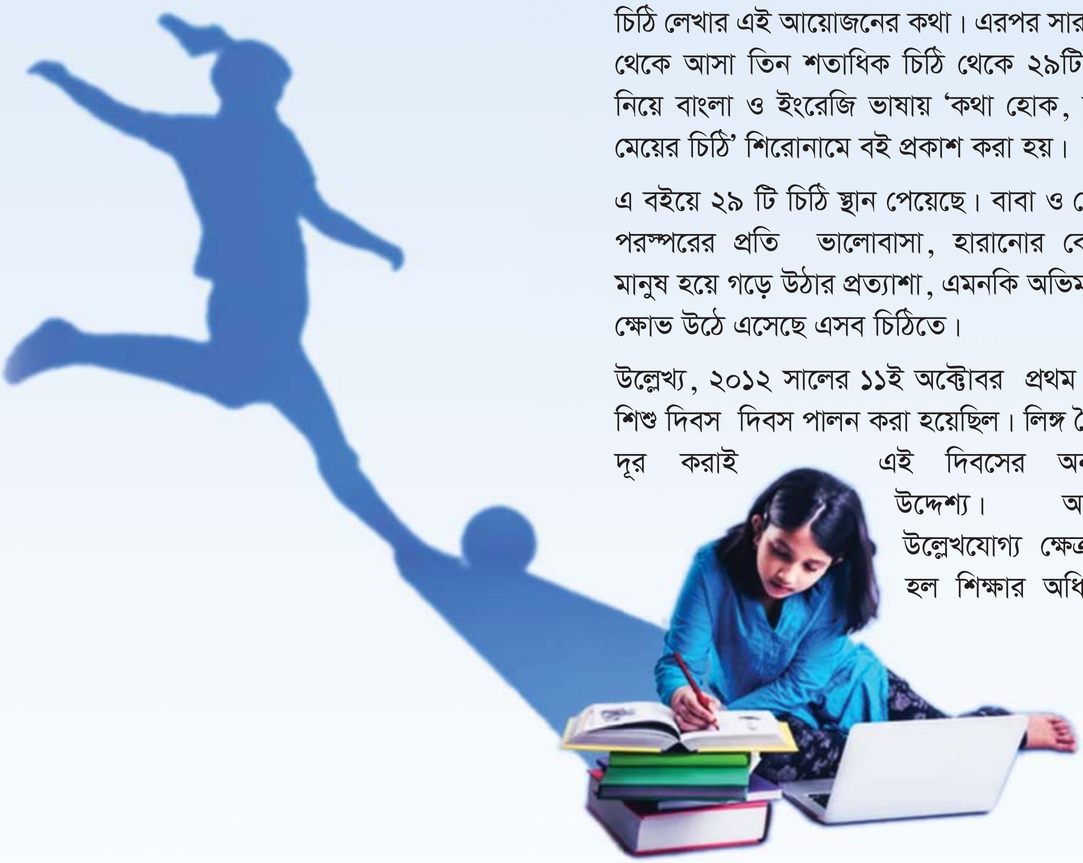

পরিপুষ্টি, আইনি সহায়তা ও ন্যায় অধিকার, চিকিৎসা সুবিধা, ও বৈষম্য থেকে সুরক্ষা, নারীর বিরুদ্ধে হিংসা ও বলপূর্বক তথা বাল্যবিবাহ।

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল নামের বেসরকারি অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি প্রকল্পরূপে আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবসের জন্ম হয়েছিল। প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল 'কারণ আমি একজন মেয়ে'(Because I Am a Girl) নামক আন্দোলনের ফলে এই দিবসর ধারণা হয়েছিল। এই আন্দোলনের মূল কার্যসূচি হলো গোটা বিশ্বজুড়ে কন্যা শিশুদের পরিপুষ্টি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। এই সংস্থার কানাডার কর্মচারীরা এই আন্দোলনকে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠা করতে কানাডা সরকারের সহায়তা নেয়।

পরে জাতিসংঘের সাধারণ সভার মধ্যে কানাডায় আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস উদযাপনের প্রস্তাব করা হয়। ২০১১ সালের ১৯শে ডিসেম্বর এই প্রস্তাব জাতিসংঘের সাধারণ সভায় গৃহীত হয় ও ২০১২ সালের ১১ই অক্টোবর প্রথম আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস পালন করা হয়। এ দিবসের প্রতি বছর এর একটা থিম বা প্রতিপাদ্য থাকে। প্রথম কন্যাশিশু দিবসর থিম ছিল 'বাল্য বিবাহ বন্ধ করা'।

দ্বিতীয়বার, ২০১৩ সালে থিম ছিল 'মেয়েদের শিক্ষা ক্ষেত্র অভিনব করে তোলা'। তৃতীয় ও চতুর্থবারের থিম ছিল, 'কৈশোরকে ক্ষমতাসম্পন্ন করা ও হিংসা চক্র বন্ধ করা'ও 'কৈশোর কন্যার ক্ষমতা: ২০৩০ সালের পথ-প্রদর্শক'। ২০১৬ সালের এই দিবসের থিম ছিল, 'মেয়েদের উন্নতি লক্ষ্যর উন্নতি'। ২০১৭ সালের কন্যাশিশু দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'মেয়েদের ক্ষমতায়নে জরুরি সহায়তা ও প্রতিরোধ পরিকল্পনা'। ২০১৮ সালের প্রতিপাদ্য ছিল 'থাকলে কন্যা সুরক্ষিত, দেশ হবে আলোকিত'। ২০১৯ সালের দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছিল 'কন্যাশিশুর অগ্রযাত্রা, দেশের জন্য নতুন মাত্রা'। ২০২০ সালের প্রতিপাদ্য ছিল 'আমার উচ্চারণ : আমাদের সমতার ভবিষ্যত'। ২০২১ সালের প্রতিপাদ্য ছিল 'শিশুর জন্য বিনিয়োগ করি, সমৃদ্ধ বিশ্ব গড়ি'। ২০২২ সালের আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'এখনই সময় ভবিষ্যৎ গড়ার, নিশ্চিত কর নিজের অধিকার'। ২০২৩ সালের কন্যাশিশু দিবসের প্রতিপাদ্য 'মেয়েদের অধিকারে বিনিয়োগ করুন: আমাদের নেতৃত্ব, আমাদের কল্যাণ'। ❑

আলোকিত মুখ

গোলাম নবী পান্না

পৃথিবীতে শিশুদের
আলোকিত মুখ
সেই মুখ দেখে দেখে
ভরে যায় বুক।

তাতে ঝরে অনাবিল
সুখ আর সুখ
কেটে যায় অমানিশা
দুখ আর দুখ।

শিশুদের ঠোঁটে ফোটে
হাসি রাশি রাশি
সেই হাসি সকলেই
বড়ো ভালোবাসি।

আজকের শিশু

আবির আহমেদ

হাসি-কান্না, স্বপ্ন-ভরা
কৌতুহলের ভাণ্ডার,
তাদের মুখে ভেসে ওঠে
আগামী দিনের ঝংকার।

পাখির মতো ডানা মেলে
উড়তে তারা চায়,
ভবিষ্যতের রঙিন ছবি
নীল আকাশে উড়ায়।

শিশুদের জন্যই বিশ্বজুড়ে
আজ এই আয়োজন,
সোনার দেশ গড়তে হলে
শিশুদেরই প্রয়োজন।

অষ্টম শ্রেণি, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

রঙিন স্বপ্ন

সাদেকুর রহমান

আজকে শিশুদের উৎসব
হাসির আলোর দিন
রঙিন স্বপ্ন আঁকা থাকে
আকাশ জোড়া চিন।

ফুলের মতো ফুটে ওঠে,
শিশুর মুখের হাসি,
ভালোবাসা ছড়িয়ে পড়ে
খুশির ধরায় ভাসি।

আনন্দ আর ভালোবাসায়
ভরে যাক দিন,
বিশ্ব শিশু দিবসে হোক
শিশুরা রঙিন।

নবম শ্রেণি, জিলা স্কুল, ময়মনসিংহ

অন্যরকম গল্প

আব্দুল্লাহ শামিল

হ্যালো ছোট্ট বন্ধুরা! তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছ, আমাদের চারপাশে যা ঘটে, তা শুধু বড়োদের জন্যই নয়, আমাদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ? ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে বাংলাদেশে একটি বড়ো আন্দোলন হয়েছিল, যার নাম 'জুলাই-আগস্ট গণ অভ্যুত্থান'। এই আন্দোলন শুধু বড়োদের জীবনেই নয়, শিশুদের জীবনেও অনেক পরিবর্তন এনেছিল। আজ আমরা সেই গল্পই শুনব, কিন্তু শিশুদের চোখ দিয়ে! কীভাবে বড়োদের সাথে সাথে শিশুরাও একটি গণ-অভ্যুত্থানের অংশ হয়ে উঠল তার গল্পই বলব আজ।

আন্দোলন কী এবং কেন হলো

বন্ধুরা, তোমরা নিশ্চয়ই জানো, আমাদের দেশে অনেক সময় কিছু সমস্যা হয়। যেমন- কিছু মানুষ ঠিকভাবে কাজ না করলে, অন্য মানুষের সমস্যা হয়। ২০২৪ সালে তেমনই কিছু সমস্যা ছিল। দেশের মানুষ মনে করলেন, সরকার দেশের মানুষের জন্য কাজ করছে না মানুষ বিরক্ত হয়ে উঠল। তাই তারা রাস্তায় নেমে আসলেন এবং তাদের দাবি জানালেন। এটাই হলো গণ-অভ্যুত্থান।

এই আন্দোলনের মূল কারণ ছিল দুর্নীতি, অর্থনৈতিক সংকট এবং মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ। মানুষ চেয়েছিল একটি সুন্দর ও ন্যায়সঙ্গত সমাজ, যেখানে সবাই সমান সুযোগ পাবে, বিনা কারণে কেউ অত্যাচারিত হবে না। এই আন্দোলনে লক্ষ লক্ষ মানুষ অংশ নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে অনেক শিশুও ছিল।

আন্দোলনের সময় মানুষ তাদের দাবি জানানোর জন্য রাস্তায় নেমে আসে। তারা প্ল্যাকার্ড নিয়ে হাঁটে, স্লোগান দেয় এবং গান গায়। আন্দোলনটি শান্তিপূর্ণ ছিল কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাবের জন্য আন্দোলনের বড়ো একটা সময় সহিংসতাও হয়েছিল। সময়ে স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং মানুষের জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছিল। এরপরেও মানুষ এই আন্দোলনের সমর্থনে রাস্তায় নেমে আসে।

শিশুদের ভূমিকা

আন্দোলনে শুধু বড়োরাই নয়, অনেক শিশুও অংশ নিয়েছিল। তোমরা হয়ত ভাবছ, শিশুরা আন্দোলনে কী করবে? আসলে শিশুরাও তাদের পরিবার ও বন্ধুদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। অনেক শিশু মিছিলে গিয়েছিল, প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়েছিল এবং সবাইকে উৎসাহিত করেছিল। তারা চেয়েছিল তাদের ভবিষ্যৎ যেন সুন্দর হয়।

কিছু শিশু আবার তাদের সৃজনশীলতার মাধ্যমে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। তারা ছবি এঁকেছিল, কবিতা লিখেছিল, গান গেয়েছিল এবং নাটক মঞ্চস্থ করেছিল। এইসব কাজের মাধ্যমে তারা তাদের মনের কথা বলেছিল এবং সবাইকে জানিয়েছিল যে, শিশুরা এই দেশের ভবিষ্যৎ।

আন্দোলনের সময় কী কী পরিবর্তন এল

এই আন্দোলনের সময় অনেক কিছু বদলে গিয়েছিল। স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাই তোমরা হয়ত অনেকদিন বাড়িতে কাটিয়েছ। খেলার মাঠে যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কারণ রাস্তায় অনেক মানুষ জমায়েত হয়েছিল। অনেক পরিবারের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাই কিছু বন্ধু হয়ত নতুন নতুন কাজ শিখতে শুরু করেছিল।

সময়টা অনেক শিশুর জন্য কঠিন ছিল। অনেক শিশু তাদের বাবা-মায়ের সাথে নিরাপদ স্থানে চলে গিয়েছিল, কারণ রাস্তায় সহিংসতা হতে পারে বলে আশঙ্কা ছিল। কিছু শিশু তাদের বন্ধুদের থেকে দূরে চলে গিয়েছিল, যা তাদের মনে দুঃখ এনেছিল।

কিন্তু বন্ধুরা, এই সময়টা শুধু কঠিনই ছিল না, এটা আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েও দিয়েছে। আমরা শিখেছি, কীভাবে একে অপরের পাশে দাঁড়াতে হয়, কীভাবে সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় এবং কীভাবে সাহসী হতে হয়। ছোটোবেলা থেকেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানোর যে শিক্ষা তোমরা পেলে তা তোমাদের বাকি জীবনে চলার পথে অনেক কাজে লাগবে। যে-কোনো অন্যায় দেখলেই তোমরা রুখে দাঁড়াবে, প্রতিবাদ করবে।

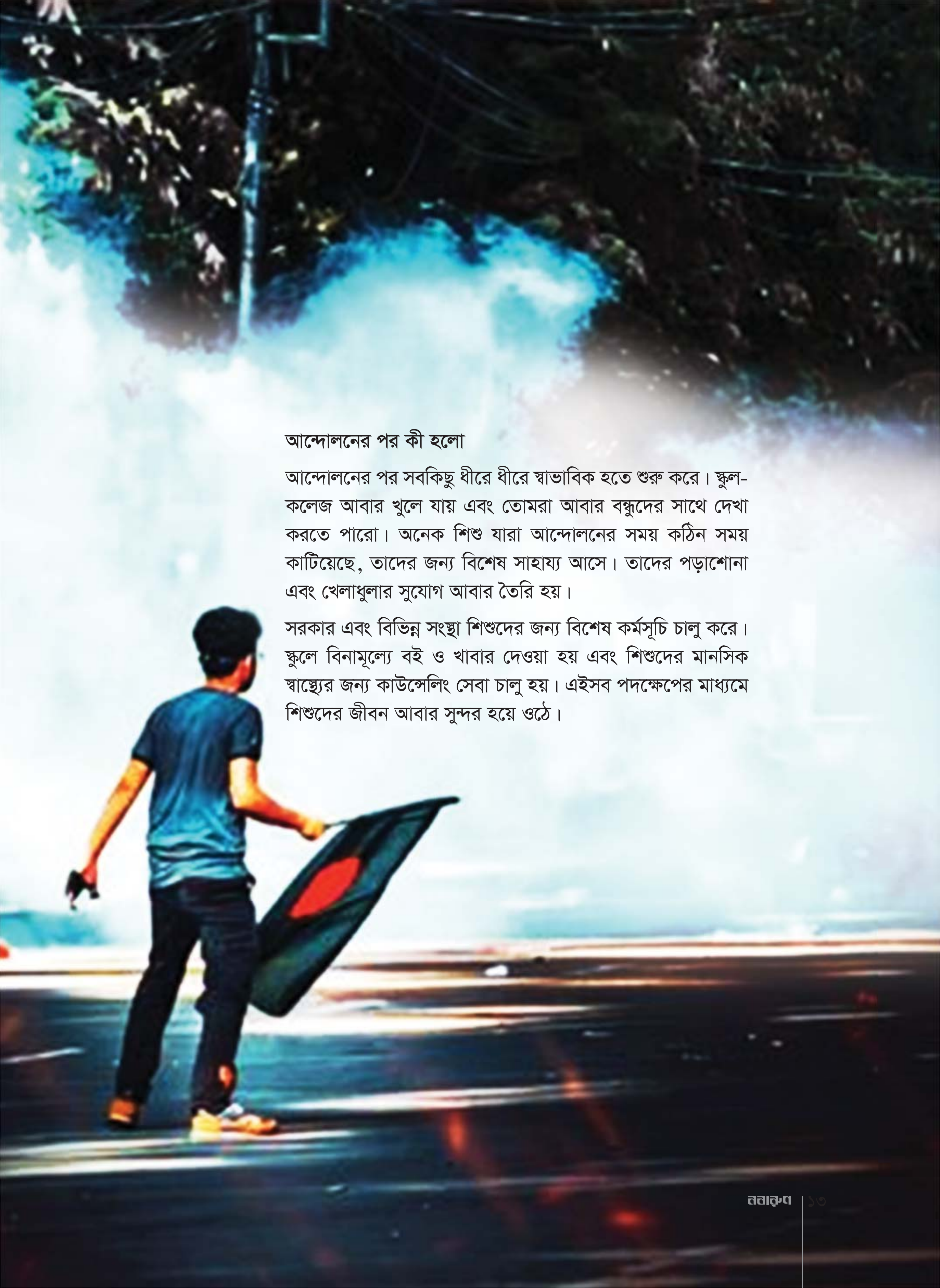

আন্দোলনের পর কী হলো

আন্দোলনের পর সবকিছু ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করে। স্কুল-কলেজ আবার খুলে যায় এবং তোমরা আবার বন্ধুদের সাথে দেখা করতে পারো। অনেক শিশু যারা আন্দোলনের সময় কঠিন সময় কাটিয়েছে, তাদের জন্য বিশেষ সাহায্য আসে। তাদের পড়াশোনা এবং খেলাধুলার সুযোগ আবার তৈরি হয়।

সরকার এবং বিভিন্ন সংস্থা শিশুদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি চালু করে। স্কুলে বিনামূল্যে বই ও খাবার দেওয়া হয় এবং শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য কাউন্সেলিং সেবা চালু হয়। এইসব পদক্ষেপের মাধ্যমে শিশুদের জীবন আবার সুন্দর হয়ে ওঠে।

শিশুরা এসব দৈনন্দিন কাজ ছাড়াও রাস্তায়, দেয়ালে আন্দোলনের স্মৃতি ধরে রাখতে নানান ছবি-গ্রাফিতি অংকনে অংশ নেয়। সেইসাথে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ট্রাফিক কন্ট্রোলের কাজেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দেশে যেই সময়টাতে আইন-শৃঙ্খলার খুব বাজে অবস্থা ছিল তখন বড়োদের সাথে সাথে শিশুরাও এলাকায় এলাকায় টহল দিয়েছে, ময়লা পরিষ্কার করেছে, রাত জেগে পাহারা দিয়েছে।

আমাদের শেখা

এই আন্দোলন থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি। আমরা শিখেছি যে, আমাদের মতামতেরও মূল্য আছে। আমরা শিখেছি যে, একসাথে থাকলে আমরা যে-কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারি। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা, আমরা শিখেছি যে আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের হাতেই।

তাই বন্ধুরা, আমরা সবাই মিলে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলব। পড়াশোনা করব, খেলাধুলা করব, এবং একে অপরের সাহায্য করব। কারণ, আমরা তো এই দেশের ভবিষ্যৎ!

এই অভ্যুত্থানে প্রায় ৮৯ জন শিশু-কিশোর শহিদ হয়। এরা আমাদের অনুপ্রেরণা। এই শহিদদের আত্মত্যাগকে বুকে ধারণ করে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। এই শহিদরা যেই চেতনা ধারণ করে জীবন উৎসর্গ করেছে আমাদের সামনে এগিয়ে চলার মূলমন্ত্র সেই চেতনা।

শেষ কথা

জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪ শুধু বড়োদের গল্প নয়, এটা আমাদের গল্পও। আমরা শিশুরা এই দেশের ভবিষ্যৎ এবং আমাদের হাতেই এই দেশকে আরও সুন্দর করে গড়ে তোলার দায়িত্ব দিয়েছে। তাই চলো, সবাই মিলে একটি সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ পৃথিবী গড়ে তুলি! ❑

শিক্ষার্থী, সাউথ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সাহসী বীর

জিশান মাহমুদ

আমি তো ভাই ভীতু মানুষ
মনে ছিল ডর
বুক চিতিয়ে বলি নাইকো
কররে গুলি কর।

তোমরা ছিলে সাহসী বীর
দূরে ঠেলে ভয়
আন্দোলনে জীবন দিয়ে
বাংলা করলে জয়।

মাহবুব আলম, তুষার, শারদুল,
শেরপুরেতে বাস
বুকের ভিতর করেছিলে
দেশপ্রেমেরই চাষ।

মিম আক্তার আর সবুজ আহমেদ
তোমরা দারুণ বেশ
আরো একবার মুক্ত হলো
প্রাণের বাংলাদেশ।

জুলাই আন্দোলন কী করে হলো

মো. সিরাজুল ইসলাম

বন্ধুরা, ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে বাংলাদেশে তোমাদের মতো ‘জেন-জি’ কিশোর তরুণরা জীবনবাজি রেখে এক অসাধ্য সাধন করেছে। রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতি থেকে মুক্তির স্বাদ এনে দিয়েছে। ছাত্র আন্দোলন থেকে গড়ে ওঠা গণ-আন্দোলনে স্বৈরাচারী সরকার প্রধানকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। জুমারস গ্রুপ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন করে অন্যায়-অবিচার, দুর্নীতি-দুঃশাসনের চক্রকে হটিয়ে এখন রাষ্ট্র সংস্কারে হাত দিয়েছে।

বাংলাদেশের অদম্য কিশোর-তরুণ প্রজন্ম আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন নোবেল জয়ীর হাতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। প্রাথমিকভাবে ৭দিনের পুলিশ শূন্য বাংলাদেশের সড়ক শৃঙ্খলা রক্ষা, শহর পরিচ্ছন্নতায় অসামান্য সফলতা দেখিয়েছে। শহরের দেয়ালগুলো গ্রাফিতি ও স্লোগানে নতুন করে সাজিয়েছে। ইন্টারনেট, স্মার্টফোন, সামাজিক মিডিয়ায় সক্রিয় এ প্রজন্ম সহস্রাধিক তাজা প্রাণকে উৎসর্গ করেছে অকুতোভয়ে, দুঃসাহসে। অন্তত ৪০০ জনের দৃষ্টিশক্তি হারানো, বিভিন্ন অঙ্গহানির পঙ্গুত্ব নিয়ে এখনও হাজার হাজার ছাত্র-জনতা হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় অনেকে মারা গেছে।

কেন আন্দোলন করতে হলো

২০১৮ সালের ছাত্র আন্দোলনে সরকারি চাকরিতে কোটা বাতিল করা হয়েছিল। ২০২৪ সালে জুনের ৫ তারিখে হাইকোর্টের আদেশে সে কোটা পুনর্বহাল হলেই আন্দোলন শুরু হয়। ৬ই জুন রায় বাতিলের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ বিক্ষোভ করেন। জুলাই মাসের ১ তারিখ থেকে সে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে দেশজুড়ে। শিক্ষক, অভিভাবক, সাধারণ জনতা, তাদের পাশে দাঁড়ায়। ক্ষমতাসীন স্বৈরাচারী সরকার দমন-পীড়নে উঠে পড়ে লাগে। ৪ঠা জুলাই শিক্ষার্থীরা দেশের বিভিন্ন মহাসড়ক আর ঢাকার শাহবাগ মোড় অবরোধ করে রাখেন। এ দিন ছাত্র সমাবেশ থেকে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। ৭ই জুলাই 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচিতে স্থবির হয়ে পড়ে রাজধানী। অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দেওয়া হয়। কোটার যৌক্তিক সংস্কারের দাবিতে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

১৫ই জুলাই কোটা সংস্কার দাবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষে জড়িয়ে ছাত্রলীগ রণক্ষেত্রে পরিণত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এলাকা। এ ঘটনায় অন্তত ২৯৭ জন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হন।

অহিংস ছাত্র আন্দোলনকে দমাতে সরকার এদিন থেকে সহিংস হয়ে ওঠে। মারমুখি হয়ে ওঠে। নিরস্ত্র, দলছুট, পুলিশের সামনে বুক পেতে দেয়া রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সাঈদকে নির্মমভাবে হত্যা করে পুলিশ। সে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল মেধার যোগ্যতায় চাকরি পাবার অধিকার। অধিকার আদায়ের জন্য মৃত্যু তার কাছে ছিল অতি তুচ্ছ। তারিখটা ছিল ১৬ই জুলাই। সেদিন দেশের বিভিন্ন স্থানে এরকমই পুলিশের বেপরোয়া গুলি আরো ৫টি প্রাণ কেড়ে নেয়। তদন্তের নামে সরকার প্রকৃত দোষীদের আড়াল করতে সচেষ্ট থাকে। নেট দুনিয়ায় সে সব দৃশ্য ভাসলেও সরকার আর পুলিশ ছিল নির্বিকার।

১৭ তারিখ ছিল মহররমের ছুটি। এদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের বিতাড়ন করে 'রাজনীতিমুক্ত' ঘোষণা করে আন্দোলনকারীরা। ১৮ তারিখ শিক্ষার্থীরা প্রবল বিক্ষোভে মাঠে নামে। পুলিশি অ্যাকশনও জোরালো হতে থাকে। রক্ত ঝরতে থাকে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের। দেশব্যাপী প্রতিরোধ,সহিংসতা, সংঘর্ষ ও গুলির ঘটনা ঘটে। মিথ্যা প্রচারে ক্ষুব্ধ জনতা রামপুরার বাংলাদেশ টেলিভিশনে আগুন দেয়। এদিন মোট ৪১ জন নিহত হন।

১৯শে জুলাই কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের 'কমপ্লিট শাটডাউন' বা সর্বাত্মক অবরোধের কর্মসূচি পালিত হয়। এদিন সারা দেশে ৮৪ জন নিহত হন। আন্দোলন দমাতে, জনগণকে বিচ্ছিন্ন করতে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয় সরকার। নেট জগতে বিচরণকারী নেটিজেনরা বিকল্প মাধ্যমে, যোগাযোগ অব্যাহত রাখে।

২০শে জুলাই দেশজুড়ে কারফিউ জারী আর সেনা মোতায়েন করে ফ্যাসিবাদী সরকার। এদিন রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ধাওয়া,সংঘর্ষ, গুলিতে ৩৮ জন নিহত হন। সব মিলিয়ে চার দিনে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪৮ জনে। পুলিশের আফসোস ছিল, পুলিশের ১টা গুলিতে একটা মরে, একটা আহত হয়, আর সবাই অমিত তেজে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এরকম প্রবল প্রতিবাদের মুখে ২১শে জুলাই সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা পুনর্বহাল-সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায় সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দেয়। ২৩শে জুলাই সরকার বাধ্য হয়ে কোটা প্রথা সংস্কার করে প্রজ্ঞাপন জারী করে। ৭ শতাংশ কোটার ভিত্তিতে এবং ৯৩ শতাংশ মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের বিধান করা হয়। রাতে সীমিত আকারে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা ফিরিয়ে দেয়।

ততক্ষণে অনেক প্রাণের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেছে। শিক্ষার্থী পরিচয় পেলেই মারধর-গ্রেফতার চলছিল।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের মোকাবিলায় তখন পুলিশ, বিজিবি, সরকার সমর্থক দলগুলো একত্রে নামে। বর্ণ-ধর্ম সব শ্রেণির অংশগ্রহণে গোটা দেশে আন্দোলনও তুঙ্গে পৌঁছে যায়।

২৯শে জুলাই জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত হয় সরকার সমর্থক ১৪ দলের বৈঠকে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলনের ছয় সমন্বয়ককে ডিবি হেফাজতে তুলে নেওয়া হয়। ডিবি পুলিশ জোরপূর্বক ছাত্র আন্দোলন প্রত্যাহারমূলক জবানবন্দি আদায় করে।

৩০শে জুলাই দেশে ঘটে যাওয়া হত্যাকাণ্ডগুলোর শোকে মায়াকান্নায় সরকার কালো কাপড়ের ব্যাজ পড়ার আহ্বান জানায়। উলটো বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারীরা তীব্র ক্ষোভে হত্যার বিচার চেয়ে মুখে লাল কাপড় বেঁধে মিছিল কর্মসূচি পালন করেন। ফেসবুক প্রোফাইল পিকচার লাল রং করে প্রতিবাদ জানায়।

৩১শে জুলাই পালন করা হয় *'মার্চ ফর জাস্টিস'* কর্মসূচি। সারা দেশে 'ছাত্র-জনতা হত্যা, গণগ্রেপ্তার ও হামলা-মামলার প্রতিবাদে জাতিসংঘের অধীনে ঘটনার তদন্ত করে বিচার এবং ৯দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এই কর্মসূচির ডাক দিয়েছিলেন আন্দোলনকারীরা।

ক্ষমতাসীনদের পর্বত প্রমাণ দুর্নীতি আর অর্থ পাচারে দেশের রাজকোষ তলানিতে নেমে গেছে। দ্রব্যমূল্য আকাশচুম্বি হয়ে উঠেছে। গুম-খুন দুঃশাসনের কবল থেকে রেহাই পেতে সব শ্রেণি পেশার মানুষ আন্দোলনে শরিক হতে থাকে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সংখ্যাগরিষ্ঠ গণমানুষের অংশগ্রহণে রূপ নেয় ছাত্র-জনতার গণ-আন্দোলনে। উপায়ান্তর না দেখে সরকার আন্দোলন দমাতে ঘরবাড়ি তল্লাশি করে ছাত্র-ছাত্রীদের আটক করেছে। পুলিশ নির্বিচারে গুলি করতে থাকে। ভয়ংকর হিংস্র হয়ে ওঠা রাষ্ট্রশক্তি ফ্যাসিবাদী সরকার হেলিকপ্টার থেকে গুলি করেছে। ঘরবাড়িতে ছাদে, বারান্দায়,বাবার কোলের শিশুসহ নিহত হয়েছে অন্তত ২০ জন। ১৬ বছরের বালককে, সমন্বয়কদের জেলে পুরেছে। শহিদ সাঈদের বীরোচিত আত্মাহুতি, ঢাকার উত্তরায় মীর মুগ্ধের *পানি লাগবে পানি* বলে আন্দোলনকারীদের পানি পান করানোয় পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ার দৃশ্য মানুষের হৃদয়কে বিগলিত করে।

এ অবস্থায় আন্দোলনকারীরা গণভবনে সরকারের আলোচনার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে। শহরের দেয়ালগুলো গ্রাফিতিতে আর স্লোগানে আন্দোলন চরম মাত্রা পায়। 'চেয়েছিলাম অধিকার,হয়ে গেলাম রাজাকার'। 'তুমি কে? আমি কে? রাজাকার রাজাকার। কে বলেছে? স্বৈরাচার, স্বৈরাচার'। এভাবে দেশি-বিদেশি এ্যাক্টিভিস্টরাও আন্দোলনকে চাঙ্গা করে তুলেছেন।

১ লা আগস্ট সারা দেশে ছাত্র-জনতাকে হত্যা, গণগ্রেফতার, হামলা-মামলা ও শিক্ষকদের ওপর ন্যাক্কারজনক হামলার প্রতিবাদসহ ৯ দফা দাবিতে 'রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোজ' (আমাদের নায়কদের স্মরণ) কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষার্থীরা।

২রা আগস্ট শুক্রবার আন্দোলনে ছাত্র হত্যার বিচারসহ ৯ দফা দাবিতে 'প্রার্থনা ও ছাত্র-জনতার গণমিছিল' কর্মসূচি পালিত হয়। এই কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশ ও ছাত্রলীগের ধাওয়া-পালটা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

৩রা আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের 'বিক্ষোভ মিছিল' কর্মসূচি পালিত হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশ ও ছাত্রলীগের সংঘর্ষে দুজন নিহত হন। শিক্ষার্থী, পুলিশ, সাংবাদিকসহ শতাধিক মানুষ আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষক, অভিভাবক, শিল্পিসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় কর্মসূচি পালিত হলেও এদিন বিকেলে আন্দোলনকারীরা কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে জড়ো হন। এতে জনসমুদ্রে রূপ নেয় কেন্দ্রিয় শহিদমিনার এলাকা। তাঁরা সমস্বরে বলতে থাকেন 'ছাত্র-জনতা অভ্যুত্থান, অভ্যুত্থান', 'পদত্যাগ পদত্যাগ, শেখ হাসিনার পদত্যাগ'। দাবি ওঠে *একদফার*। 'মানুষের জীবনের নিরাপত্তা ও সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সমবেত জনতার সমর্থনে '৬ সমন্বয়ক' এক দফা দাবির সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এক দফার নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম। দফাটি হলো, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ সরকারের পতন ও ফ্যাসিবাদের বিলোপ। আর এ লক্ষ্যে ঘোষণা দেওয়া হয় 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচির। লক্ষ্য হলো, শহিদমিনারে গণজমায়েত। এরপর গণভবন ঘেরাওয়ের যাত্রা। এদিন সেনা সদরে গুরুত্বপূর্ণ সভা হয়।

৪ই আগস্ট সরকার পতনের 'এক দফা' দাবিতে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। কর্মসূচির প্রথম দিন ৪ঠা আগস্ট সারা দেশে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এর আগে কর্মসূচি স্থির করা হয়েছিল, *মার্চ টু ঢাকা* ৬ তারিখ মঙ্গলবার হবে। পরে ১দিন এগিয়ে ৫ তারিখ সোমবার ঢাকামুখী অভিযাত্রা শুরু করে। অবস্থা বেসামাল, বেগতিক দেখে সরকার সারাদেশে

অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করে। ২জনের বেশি মানুষ রাস্তায় জড়ো হতে পারবে না। জড়ো হলেই গুলি। এছাড়া সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে তিন দিনের। অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয় আদালতের কার্যক্রম। এদিন জীবন হারান কমপক্ষে ১০৪ জন। আহত হন কয়েক হাজার।

৫ই আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের লং মার্চ কর্মসূচি পালিত হয়।

সারা দেশে শক্তভাবে কারফিউ পালনের ঘোষণা দেয় সরকার। শুরু হয় ব্যাপক ধরপাকড়। বিভিন্ন স্থানে মিছিল-সমাবেশে গুলি চালায় পুলিশ ও আওয়ামী

বাহিনী। তবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা 'মার্চ টু ঢাকা'র এক দফা কর্মসূচিতে অটল থাকেন।

সমন্বয়কদের আহ্বানে সোমবার সকাল থেকেই দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সাধারণ মানুষ এবং শিক্ষার্থীরা জড়ো হতে থাকে ঢাকার আশপাশে। যদিও এর মধ্যে বিভিন্ন স্থানে জমায়েতে বাধা দেয় পুলিশ। চালানো হয় গুলি। কারফিউয়ের ঘোষণা থাকায় সকাল থেকে রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলে। সকাল সাড়ে ১১টা পর্যন্ত তারা ঢাকার রাজপথে কাউকে নামতে দেয়নি; ইন্টারনেট আবারও বন্ধ করে দেয় সরকার। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে জমায়েত। মানুষের ঢল নামে ঢাকার প্রবেশ পথগুলোতে। বিশেষ করে শনির আখড়া-চিটাগং রোড, উত্তরা, রামপুরা, মোহাম্মদপুর এলাকায়। পুলিশ এবং ছাত্রলীগ-যুবলীগ বাধা দিলেও তা মাড়িয়েই মানুষের স্রোত ঢাকামুখী হয়।

এরপর রাজপথে বাড়তে থাকে গণমানুষের বিপুল জমায়েত। দুপুর গড়িয়ে বিকেল নাগাদ রাজপথগুলো গণজোয়ারে পরিণত হয়। এরই মধ্যে আন্দোলনকারীদের ওপর বিভিন্ন জায়গায় সরকারি বাহিনী নির্বিচারে গুলি করে। এদিনও ৮৮ জন নিহতের খবর পাওয়া যায়। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কিছু নেতাকর্মী শহিদমিনারে জমায়েত হলেও সেখানে বাধা দেয় পুলিশ। এর মধ্যে বিপুলসংখ্যক সাধারণ জনতা দখল নেয় শাহবাগ চত্বর। সেখানে সেনাবাহিনীর টহল থাকলেও তারা বাধা দেয়নি। পাশাপাশি ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সাধারণ মানুষের মিছিল শাহবাগমুখী হওয়া শুরু করে। দুপুর একটার দিকে জানা যায়,সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। দুপুর দেড়টা থেকে শেখ হাসিনার পদত্যাগের বিষয়টি জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দুপুর তিনটার দিকে একটি সামরিক হেলিকপ্টারে পুরনো এয়ারপোর্ট যান, সেখান থেকে সামরিক বিমানে চড়ে ১৪টি লাগেজসহ দেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন। রাজপথে শুরু হয় বিজয় উল্লাস। বিকেল ৪টার দিকে সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ভাষণে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন। আপনারা শান্তিশৃঙ্খলার পথে ফিরে আসুন। কারণ তা না হলে আমাদের দেশের অনেক ক্ষতি হচ্ছে। অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি আমরা।

আগস্টের ৮ তারিখে কানাডা অলিম্পিক থেকে ফিরে ছাত্র-জনতার সমর্থিত অধ্যাপক ড.মুহাম্মদ ইউনূস অন্তর্বর্তী বিপ্লবী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেন।

১লা জুলাই শুরু হওয়া অধিকারের লড়াই চলতে থাকে এক নাগাড়ে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আত্মাহুতির রক্তাক্ত জুলাই এক সময় অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। চরম পরিণতি আসে ৩৬ দিনে,অবিশ্বাস্য বিজয় অর্জিত হয় আগস্টের ৫ তারিখে। ১৬ বছরের অত্যাচারের বিভীষিকা পার করে মুক্তির সুবাতাস বয়ে আনে জেনজি'র নেটিজেনরা,ছাত্র-জনতা, যেখানে নারী এবং মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ছিল ব্যাপক। ১লা জুলাই থেকে টানা ৩৬দিনে অর্জিত নতুনতর বিজয়, সংস্কারমুখী অভিযাত্রা এ প্রজন্মের কাছে হয়ে ওঠে ৩৬শে জুলাই। যা শোভা পাচ্ছে গ্রাফিতিতে সারা দেশের দেয়ালে দেয়ালে। স্বপ্নময় চোখে তারা নতুন বাংলাদেশ গড়বে। ❑

তথ্যসূত্র:

১। দৈনিক কালবেলা, ০৬ই আগস্ট ২০২৪

২। দৈনিক প্রথম আলো, ০৬ই আগস্ট ২০২৪

৩। বিবিসি নিউজ বাংলা, ০৬ই আগস্ট ২০২৪

৪। দৈনিক আমার দেশ, ২২শে ডিসেম্বর,২০২৪

৫। অনলাইনের বিভিন্ন সূত্র।

অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সরকারি বিএল. কলেজ, খুলনা

ইতিহাস

মো. মনির হোসেন

পাখির ডানায় ভোরের বাতাস
বয়ে আনে স্মৃতি
জুলাই-আগস্টের সকাল জাগে
ইতিহাসের স্মৃতি।

নদীর ঢেউয়ে ভাসে স্বপ্ন
বয়ে চলে দূর
প্রাচীন খালের কলতানে
শোনা যায় নতুন সুর।

মাটির গন্ধ, রক্তমাখা
ফিরে আসে বারবার,
সেই গন্ধেই ফুল ফোটে
বিপ্লবের খবর।

প্রকৃতির বুকের খাতায়
ইতিহাস খোদাই হয়,
ভবিষ্যতের বীজ বুনে দেয়
শান্ত শক্তিময়।

নতুন দিন

আরিফুল ইসলাম

নতুন ভোরের স্বপ্ন আঁকে
আগুন হয়ে জ্বলে
জুলাই-আগস্ট রক্ত লেখা
সাহস খুঁজে চলে।

মিছিল ধরে সাহসী হাত
গানের মতো বাজে
প্রত্যয়ের দীপ্ত বাতি
আঁধার রাতের মাঝে।

এই লড়াই শুধু শুরু
থামার কথা নয়
নব জাগরণ গড়তে চায়
নতুন দিনের জয়।

গল্প

হাম্মার বেটাক মারল কেনে

নাসীমুল বারী

মেছের রুমে ঢুকেই আবু সাঈদ খুব তাড়া দেয় সহপাঠী বন্ধু খলিলকে।

'আজ তো ষোলো তারিখ। এখুনি বের হতে হবে।'

আবু সাঈদের দিকে তাকিয়ে খলিল বলে, কী হয়েছে রে? এমন বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে কেন? কোনো সমস্যা?

-আন্দোলন কি সমস্যা ছাড়া মসৃণ হয়? শোন্, আমি যদি মরি, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমার লাশ রাস্তা থেকে তুলবি না।

ভীষণ চমকে আবু সাঈদের দিকে তাকায় খলিল। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, কী সব বলছিস বাজে কথা!

-বাজে না রে বাজে না! দেখলি না ছেলেপেলেরা

কেমন হুমকি ধমকি দিচ্ছে মিছিল না করতে। বাংলা ব্লকেড তুলে নিতে। আমি অর্গানাইজ করি বলে আমাকেও চড়-থাপ্পর মেরেছে। আমি...

কথা শেষ না করে উঠে দাঁড়ায়। প্রত্যয়ী কণ্ঠে বলে, দাবি আদায় করতে হবে যে। আমার বাবা তো কৃষক, তোর বাবাও। তাহলে আমরা কোন কোটায় চাকরি পাবো? আমাদের লেখাপড়া আর মেধা যাবে কই?

-কিন্তু... লাশ... কী বলছিস এসব?

-বলছি, ঠিক বলছি। আমি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন অর্গানাইজ করছি। ঢাকা থেকে কী কী ঘোষণা আসছে তাও সমন্বয় করছি আরো কয়েকজনের সাথে মিলে। বৈষম্যবিরোধী এ আন্দোলন ওদের সহ্য হচ্ছে না। আমাকে মারল। আমি থামলেই কি থেমে যাবে এ রক্তপ্রবাহ? তারুণ্যের জোয়ার, থেমে যাবি তোরা?

হাতটাকে মুষ্টিবদ্ধ করে খলিল বলে, আমরা লড়াই করব। সবাই মিলে লড়াই করব, তবু দাবি আদায় থেকে এক পাও নড়ব না।

এ তারুণ্যই বারবার লড়াই করেছে বৈষম্যকে দূর করতে। বায়ান্নে বাঙালিরা ভাষা বৈষম্যের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছিল। ছাত্ররাই সেদিন আন্দোলন সংগ্রামে গুলির মুখে বুক পেতে দিয়েছিল। ঊনসত্তরে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল বাঙালি। সেসময় ছাত্ররাও ছিল নেতৃত্বের অংশ। তারপর একাত্তরে নয় মাস যুদ্ধ করে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন হলো আমার দেশ। আমার বাংলাদেশ। এ স্বাধীনতার প্রথম ও প্রধান প্রত্যাশা ছিল আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূর করে সাম্যের উদাহরণ তৈরি করা।

স্বাধীনতার চুয়ান্ন বছর পার হলো। সরকার আসে নানা ধারার, দেশ চালায় নানা জনে। তবু স্বাধীনতার স্বাদ পেল না স্বাধীন দেশের কোনো প্রজন্মই। শুরু থেকেই এখনো বৈষম্য দূর হয়নি। রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা বৈষম্যকে নতুন রূপে প্রতিষ্ঠা করে।

এ সময়ের তারুণ্য এমন কিছু আর মেনে নিতে চায় না। বৈষম্য আর অবরুদ্ধতায় এদের রক্তে আগুন লেগে যায়। শুরু করে কোটার বৈষম্য নিয়ে লড়াই।

বৈষম্যের এ সময়ে সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে নানা কোটায় চাকরির মেধাকে সংকুচিত করে ছিল। এসব মুক্ত মেধাটুকুও আবার রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার কালো সড়কে ঢুকে গেছে।

মেধার এ সংকোচন থেকে মেধাকে মুক্ত করতেই হবে। দূর করতে হবে আগে কোটাকে, তারপর অন্যান্য বৈষম্যকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তারুণ্যের রক্তের লেলিহান ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। নাহিদ, আসিফ, মাহফুজ, সারজিস, হাসনাত, কাদের প্রমুখেরা এ লেলিহান আন্দোলনের তপ্ত সৈনিক।

ছড়িয়ে পড়ে আন্দোলন রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও। আবু সাঈদ, খলিল ওরা রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়েরই তারুণ্যের লেলিহান। কোটা, বৈষম্য, অনাসৃষ্টি সব দূর করতে হবে। পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের তারুণ্যের জোয়ার সমান্তরালে ছড়িয়ে পড়ে।

আবু সাঈদ রুম থেকে বের হয়, সাথে সাথে খলিলও। দুপুরে বৈষম্যবিরোধী মিছিল। খামার মোড় থেকে মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নম্বর গেট দিয়ে ক্যাম্পাসে চক্কর দিবে। তারপর পার্ক মোড়ে এসে বাংলা ব্লকেড অবস্থান কর্মসূচি।

খলিলকে তাড়া দিয়ে বলে, তাড়াতাড়ি হাঁট তো। মিছিলটা অর্গানাইজ করতে হবে। আমাদের দৃঢ়তার সাথে আগাতে হবে। বিজয় আনতেই হবে।

ওরা খামার মোড়ের পথে রওনা দেয়। পথে দেখা হয় বন্ধু-সহযোদ্ধা আবরারের সাথে। তাকে দেখে বলে, কদ্দুর কী করলি?

-জানিয়ে এসেছি সবাইকে।

-মানুষ কই?

-আসতেছে দল দলে, ওই দেখ। ঢাকা থেকে নতুন কী কর্মসূচি এসেছে?

-আগেরটাই, বাংলা ব্লকেড কর্মসূচি। আমরা পার্ক মোড় ব্লকড করব। আগে মিছিল হবে। দাবি আদায়

না হওয়া পর্যন্ত বাংলা ব্লকেড কর্মসূচি চলবেই।

দ্রুত হাঁটছে ওরা। হাঁটতে হাঁটতে আবু সাঈদ বলে, পুলিশের সাথে আমাদের প্রতিপক্ষ লীগের ছাত্ররা হুঁশিয়ারি দিয়েছে আমরা যেন মিছিল না করি। আমরা যেন বাংলা ব্লকেড না করি।

আবরার চোখ বড়ো করে বলে, মামার বাড়ির আবদার আর কী!

আচমকাই দুইজন পুলিশ পথ আগলে ধরে। ছুটে আসে ছাত্রলীগের ছাত্ররাও। ওরা কেউ আবু সাঈদদেরকে মিছিলে যেতে দিবে না। আবু সাঈদ জানতে চায়, কেন আটকানো হচ্ছে আমাদেরকে?

ওরা বলে, তোমরা সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করো।

-হ্যাঁ করি। করার জন্যই তো এসেছি। সরকার আর তোমরাই তো মেধার শ্রেণিবৈষম্য তৈরি করেছ। আমরা বৈষম্যের অবসান চাই। চিরতরে অবসান চাই। পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরেও যা পারেনি, এখন তাই করতে চাই।

ওদের এক ছাত্র বলে, এত নীতিকথা বলতে হবে না।

আবু সাঈদ চড়াগলায় বলে, নীতিকথা নয় অধিকারের কথা বলছি। অধিকারের জন্য বৈষম্যের বিরুদ্ধে একবার একাত্তরে দাঁড়িয়েছিল ছাত্র-জনতা। আমরা তাদেরই উত্তরসূরি।

ওদের আরেক ছাত্র বলে, তখন পাকিস্তানি বৈষম্য ছিল এখন আমরা স্বাধীন। এখানে আবার বৈষম্য কীসের?

-এটাই তো বুঝো না তোমরা। এখন ঊনসত্তরের চেয়েও শতগুণ বৈষম্য করে রেখেছ তোমরা, তোমাদেরই সরকার। আরো আরো সব সরকার। আমরা আবার যুদ্ধ শুরু করেছি। প্রকৃত আর স্থায়ী বৈষম্যবিরোধী এ যুদ্ধে আমাদের জিততেই হবে। আমাদের অস্ত্র মেধাবীদের ঐক্য। সারা দেশের মেধারীরা আজ এক হয়েছে।

আর কথা না বলে ওদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে খামার মোড়ের দিকে আগাতে থাকে ওরা তিন জন।

এক সময় খামার মোড় থেকে বিশাল মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাসের দিকে আগাতে থাকে শিক্ষার্থীরা। আবু সাঈদ সবার সামনে থেকেই মিছিলকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মিছিলকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। হাতে একটা ক্রিকেট স্ট্যাম্প।

মিছিল ক্যাম্পাসের প্রধান গেটের কাছাকাছি আসতেই পুলিশ টিয়ারসেল মেরে আটকে দেয়। পুলিশকে এ মিছিল আটকাতেই হবে। বাংলা ব্লকেড ভণ্ডুল করতেই হবে। যেতে দেবে না কোনোমতেই। টিয়ারশেল মেরে তাই রুখতে চেষ্টা করে পুলিশ।

মিছিল একটু থামে।

আবু সাঈদ একাকী আরও সামনে এগিয়ে যায়। হাতে এখনো স্ট্যাম্প। মিছিলকে এগিয়ে আসার ইঙ্গিত দেয়। পুলিশও টিয়ারশেল মেরে মেরে আটকাতে চেষ্টা করে। আবু সাঈদ এবার দুই হাত দুই দিকে বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে যায়। চিৎকার করে বলতে থাকে- গুলি চালাও, তবু আমাদের মিছিল থামবে না।

দুজন পুলিশ সদস্য শর্টগান তাক করে অতি উৎসাহী হয়ে ধীরে ধীরে আগাতে থাকে। আবু সাঈদ পিছু না হটে জোরে চিৎকার দিয়ে বলে, চালাও গুলি, আমরা পিছু হটব না।

অসীম আকাশে আবু সাঈদের কথা মিলিয়ে যায়। তবু একাকী প্রতিরোধ গড়ে তোলে। আচমকা একটা বুলেট এসে লাগে তার বুকে। পড়ে যায় মাটিতে। চমকে তাকায় পুলিশের দিকে- সত্যি ওরা গুলি মেরেছে? আমাদের আন্দোলন হেরে যাবে?

হতে পারে না কিছুতেই। আবার উঠে দাঁড়ায়। হাতের স্ট্যাম্পটা দিয়ে গুলি ঠেকাবে এবার। আবারও দুই হাত প্রসারিত করে দাঁড়ায়। আকাশের শূন্যতায় চিৎকার করে বলে, আমরা হটব না, আমরা পেছনে যাবো না।

সে কথা শূন্যতায় মিলিয়ে যেতে যেতেই একসাথে চারটি বুলেট এসে পড়ে ওর বুকে, শরীরে।

এ্যাঁ... বলতে বলতে লুটিয়ে পড়ে। মিছিল থেকে ছুটে আসে সহযোদ্ধারা। তরতরিয়ে রক্ত ঝরছে। ধরাধরি করে এক অটো রিকশায় তুলে নেয় আবু সাঈদকে।

রংপুর মেডিকেলে নিয়ে যাচ্ছে।

ওদিকে মিছিলে তখন যেন আগুন জ্বলে উঠছে। বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে হাজার হাজার শিক্ষার্থী। তাদের প্রিয় নেতা-সহপাঠী আবু সাঈদ গুলিবিদ্ধ।

পুলিশ, ছাত্রলীগ আর বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী-ত্রিমুখী সংঘর্ষ চলছে। দুর্বার গতি সঞ্চারিত হলো এ বৈষম্যবিরোধী টর্নেডোতে।

প্রচণ্ড গতির টর্নেডো। এরই মধ্যে খবর আসে আবু সাঈদ আর নেই।

নে-ই- - -!

এদেশে সেই একাত্তর পরবর্তী গড়ে ওঠা রাষ্ট্রীয়-সামাজিক বৈষম্য দূর করার নতুন যুদ্ধের প্রথম শহিদ দুর্জয় বীর আবু সাঈদ। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে এক ধ্বনি এল, 'হামার বেটাক মারল কেনে?' ❑

গল্পকার

গল্প

আমি আনাস বলছি

কামাল হোসাইন

আমি আনাস। তোমরা কি আমাকে চিনতে পারছ? হয়ত কেউ আমাকে চিনছ। কেউ চিনছ না। আমি তোমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছি। যেখানে কেউ একবার গেলে আর ফিরে আসতে পারে না। তাহলে ঘটনাটা খুলেই বলি তোমাদের। জানো কিনা জানি না, আমার দু'চোখজুড়ে দারুণ সব স্বপ্ন খেলা করত। সেই স্বপ্নরা কেবলই আমাকে অচিন জগতে নিয়ে যেত। সেই স্বপ্নের ডানায় চড়ে হারিয়ে যেতাম কোন সুদূরে! আমি এও জানি, তোমাদের সকলেরই আমার মতো স্বপ্নবাসরে হারিয়ে যাওয়ায় নিদারুণ ইচ্ছে। তবে হ্যাঁ, চোখ বন্ধ করে কল্পনার পাখায় চেপে কোথাও বেড়াতে পারলে কিন্তু মন্দ হয় না!

যারা আমার এই স্বপ্নের কথা পড়ছ, জানি তোমাদেরও এমন অসীম স্বপ্ন চোখের তারায় নেচে বেড়ায়। বাবা-মায়ের প্রাণভোমরা হয়ে হেসে খেলে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছ তোমরা। পড়াশোনা আর নতুন নতুন জীবনের সন্ধানে নিরন্তর পথচলা তোমাদের একমাত্র পাথেয়। পারিবারিক নিবিড় ছায়ায় সযত্নে বেড়ে উঠছ তোমরা। পরিবার তো বিশাল ছাতার মতো। এই ছায়ায় যতদিন কেউ থাকে, ততদিন তার আর কোনো চিন্তা থাকে না। এই ছায়াতলে যারা বেড়ে উঠছ, তারা একদিন বড়ো হয়ে বাবা-মায়ের স্বপ্ন পূরণ করবে এটাই তোমাদের প্রত্যাশা। দেশের মুখ আলোয় উদ্ভাসিত করার প্রত্যয় তোমাদের চোখেমুখে টগবগ

করে ফুটছে। কোনো অশুভ বিষণ্ণতাই তোমাদের ছুঁতে পারে না। একটা সুপুষ্ট মুকুলের মতো প্রস্ফুটিত হবার দিন গুনছ তোমরা। যে মুকুলের প্রতিটি পাপড়ি তোমাদের সুন্দর আগামীর পথ দেখাবে। সেই মুকুলের পাপড়িকে পরিপূর্ণভাবে ফুটে ওঠার জন্য দিনরাত কঠোর পাহারায় রয়েছেন তোমাদের বাবা-মা। যেন কেউ তোমাদের কলুষমুক্ত নাভিমূলে বিষাক্ত হেমলক ঢালতে না পারে। যেন কোনো অশুভ হাত তোমাদের সুন্দর স্বপ্নের সমাপ্তি ঘটাতে না পারে। যেন কোনো গোষ্ঠী মানবতা ভুলে গিয়ে তোমাদের প্রতি অমানবিক-নিষ্ঠুর আচরণ করতে না পারে। মোটাদাগে নিরাপদে যাতে তোমরা তোমাদের জীবনকে গঠন করতে পারো, সেই স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছেন তাঁরা। তোমার আগামী যেন সুন্দর ও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর হয়, সেই মাহেন্দ্রক্ষণের প্রতীক্ষা করছেন তাঁরা। আর এগুলোই তো একজন অভিভাবকের নির্মল চাওয়া, তাই না?

এরকম স্বপ্ন আমারও কিন্তু ছিল। এরকম আকাঙ্ক্ষা সব বাবা-মায়ের মতো আমার বাবা-মায়েরও ছিল। তাঁরাও স্বপ্ন দেখতেন, একদিন আমি লেখাপড়া শিখে বড়ো হয়ে সমাজের একজন আদর্শ নাগরিক হব। সত্যিকার দেশপ্রেমিক হয়ে দেশের জন্য কল্যাণকর কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করব। সমাজে-দেশে কোনো অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করব। মানুষের অধিকার আদায়ে প্রয়োজনে রাজপথে সংগ্রাম করব। জুলুম-নিপীড়নের মূলোৎপাটন করতে সাহসী ভূমিকা রাখব।

আমি ঢাকার গেণ্ডারিয়া এলাকার আদর্শ একাডেমির দশম শ্রেণির ছাত্র ছিলাম। আমার পড়াশোনার পাশাপাশি এসব অধিকারের বিষয়ে জানতে শুরু করেছিলাম আমি। বিশেষ করে আমার আশপাশে থাকা বড়ো ভাইদের কাছ থেকে ওই সময়ের শাসকদের অনিয়ম, মানুষের ওপর জুলুম, একটু প্রতিবাদ করলে মামলা, জেল, গুম, করার মতো অন্যায় করে যাওয়ার কথা জানতে পারলাম। আসলে মানুষের যে সকল মৌলিক অধিকার একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের দেওয়ার কথা, সেটা পূরণ না হলে, সেটা বিঘ্নিত হলে, একমুখী আচরণ করলে, দেশের মানুষকে রাষ্ট্র কর্তৃক মানুষ মনে না করলে, যারা এসব ন্যায্য দাবি তুলল তাদের উপর রাষ্ট্রের সকল শক্তি দিয়ে দমন করলে মানুষ তো ফুঁসে উঠবেই।

তাই তো আমাদের এই প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশে এরকম হাজারো অন্যায়ের বিরুদ্ধে বরাবরের মতো এদেশের আপামর জনসাধারণ তথা এদেশের ছাত্রজনতা একটা হায়েনা শাসকদলের বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। তাদের অনৈতিক আচরণ মানুষ দীর্ঘদিন ধরে দেখতে দেখতে আর দেখতে পারেনি। গোটা দেশের মানুষ একযোগে সেই নরাধম শাসকগোষ্ঠীকে ক্ষমতা থেকে নামাতে রাজপথে নেমে পড়ল। কারা নামল? আবালবৃদ্ধবনিতা বলতে যা বোঝায়– মানে কালে কালে আমাদের এই সোনার ভূখণ্ডকে শত্রুদের কালো হাত থেকে বাঁচাতে যেভাবে সাতচল্লিশে, বায়ান্নে, ঊনসত্তরে, একাত্তরে সব শ্রেণি-পেশার মানুষ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল, ঠিক তেমনিভাবে দু' হাজার চব্বিশেও মানুষ গণ-আন্দোলনে ওই সময়ের ফ্যাসিস্ট সরকার এবং তার দোসরদের হাত থেকে দেশকে, দেশের মানুষকে, দেশের সার্বভৌমত্বকে নিষ্কণ্টক করতে নেমে এলো রাজপথে। সহজ ও ন্যায্য কিছু দাবি তুললেও সরকার তার প্রশাসন এবং তার দলের পেটোয়াবাহিনী দিয়ে এই যৌক্তিক আন্দোলনকে দমাতে চাইল। আর এরই ফলসরূপ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া অনেককে নির্যাতন চালাতে শুরু করল। ক্ষমতার মোহে শাসকদল যেন পাগল হয়ে গেল। আর তাই দিন দিন তাদের অত্যাচারের মাত্রাও বাড়তে থাকল পাল্লা দিয়ে।

দেয়ালে পিঠ ঠেকলে যা হয় আর কি। প্রায় এক বছর যাবত এরকম নানা বিষয় নিয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম চলছিল। যে আন্দোলনকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন বলা হচ্ছিল। আসলে ওই সময় ক্ষমতায় থাকা সরকার নানাভাবে দেশের সিংহভাগ মানুষকে ঠকিয়ে কেবল এক শ্রেণির মানুষের জন্যই সুযোগ-সুবিধা দিয়ে যাচ্ছিল। যা অনেকটা ১৯৭১

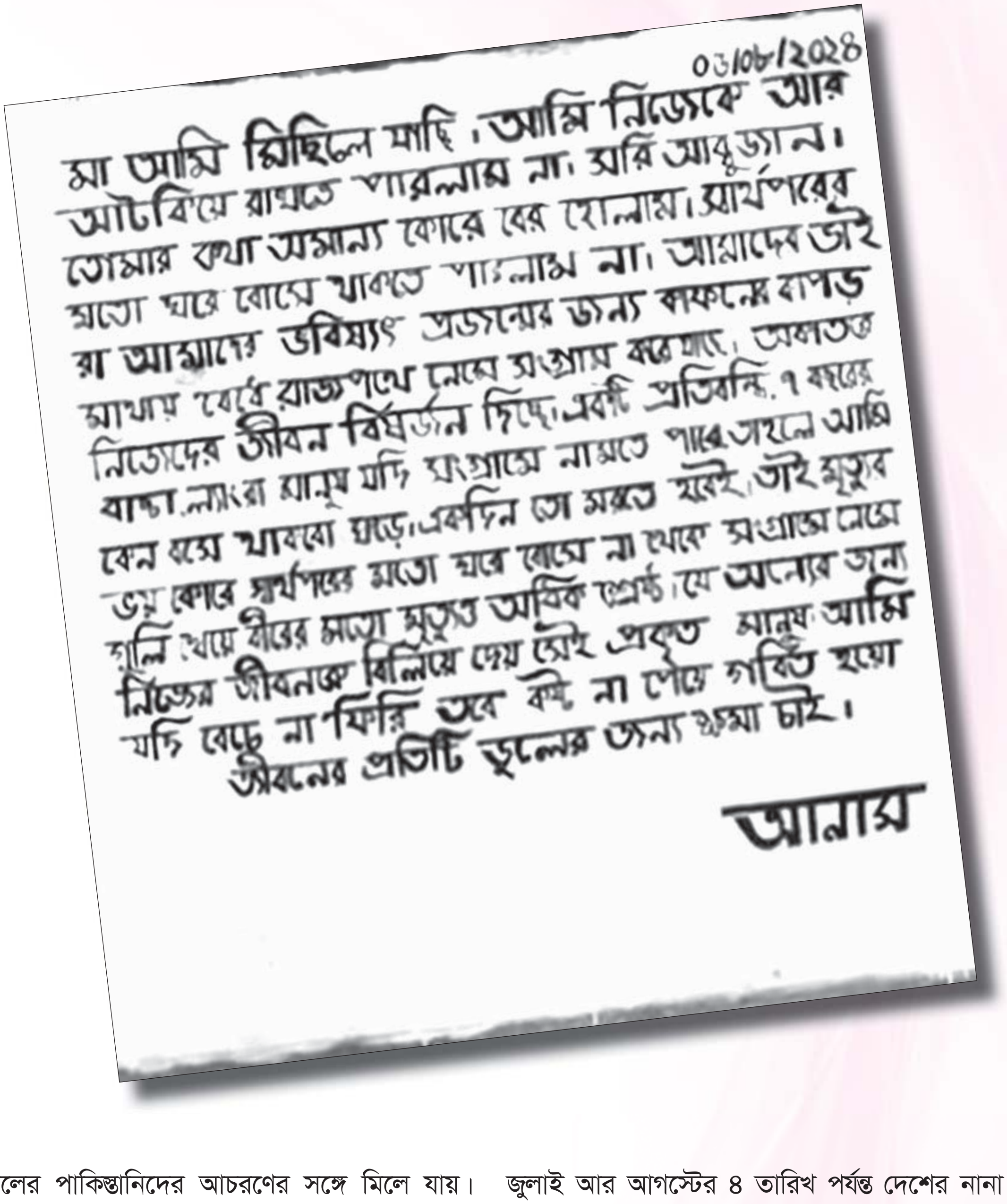

০৩/০৮/২০২৪

মা আমি মিছিলে যাচ্ছি। আমি নিজেকে আর
আটকিয়ে রাখতে পারলাম না। সরি আব্বুজান।
তোমার কথা অমান্য কোরে বের হোলাম। স্বার্থপরের
মতো ঘরে বোসে থাকতে পারলাম না। আমাদের ভাই
রা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কাফনের কাপড়
মাথায় বেঁধে রাজপথে নেমে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। অকাতরে
নিজেদের জীবন বিসর্জন দিচ্ছে। একটি প্রতিবন্ধি ৭ বছরের
বাচ্চা, ল্যাংড়া মানুষ যদি সংগ্রামে নামতে পারে তাহলে আমি
কেন বসে থাকবো ঘরে। একদিন তো মরতে হবেই। তাই মৃত্যুর
ভয় কোরে স্বার্থপরের মতো ঘরে বোসে না থেকে সংগ্রামে নেমে
গুলি খেয়ে বীরের মতো মৃত্যুও অধিক শ্রেষ্ঠ। যে অন্যের জন্য
নিজের জীবনকে বিলিয়ে দেয় সেই প্রকৃত মানুষ। আমি
যদি বেঁচে না ফিরি তবে কষ্ট না পেয়ে গর্বিত হয়ো
জীবনের প্রতিটি ভুলের জন্য ক্ষমা চাই।

আনাস

সালের পাকিস্তানিদের আচরণের সঙ্গে মিলে যায়। তাই তো মানুষ আর ঘরে বসে থাকতে পারল না। একটা পর্যায়ে সরকারের ভয়াবহ নির্যাতনের কারণে, একচোখা নীতির কারণে ছাত্রজনতা অনেক দাবি থেকে সব ছেঁটে দিয়ে এক দফা দাবি তুলল– সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে। দেখতে দেখতে এই আন্দোলন জুলাই-আগস্টে তীব্র হয়ে উঠল। জুলাই আর আগস্টের ৪ তারিখ পর্যন্ত দেশের নানা প্রান্তে অসংখ্য মানুষকে সরকার তার লোক দিয়ে, পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাবসহ নানা বাহিনী দিয়ে হত্যা করল।

সরকারের এই স্বৈরাচারী আচরণের কারণে তখন আর কেউই ঘরে বসে থাকল না। অনেক মা তাঁর সন্তানকে নিয়ে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। যারা রাজপথে

আন্দোলন করছিল তাদের জন্য যে যা পেরেছে খাবার, চিড়ে, মুড়ি, পানি নিয়ে হাজির হয়েছে। আন্দোলনে সমর্থন যুগিয়েছে। আমিও এসব টিভি নিউজে দেখে দেখে আর ঘরে বসে থাকতে পারলাম না।

আমার পুরো নাম শাহরিয়ার খান আনাস। আমি ৫ই আগস্ট সকালে আমার মাকে উদ্দেশ্য করে একটা চিঠি লিখেছিলাম। যেটা এখন তোমাদের অনেকের কাছেই পৌঁছে গেছে। হয়ত চিঠিটা অনেকের কাছে এখনও পৌঁছায়ওনি। আমি হারিয়ে যাওয়ার পর আমার মা সেই চিঠি খুঁজে পান। সেই সময় কিছু ভুলভাল বানানে লিখেছিলাম সেই চিঠি। এখন বিষয়টা মনে হলে খুব হাসি পায়। তাই এখানে সেই চিঠিটা সংশোধন করে তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম। সেখানে লিখেছিলাম–

'মা, আমি মিছিলে যাচ্ছি। আমি নিজেকে আর আটকিয়ে রাখতে পারলাম না। সরি আব্বুজান। তোমার কথা অমান্য করে বের হলাম। স্বার্থপরের মতো ঘরে বসে থাকতে পারলাম না। আমাদের ভাইরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কাফনের কাপড় মাথায় বেঁধে রাজপথে নেমে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। অকাতরে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিচ্ছে। একটি প্রতিবন্ধী কিশোর, সাত বছরের বাচ্চা, ল্যাংড়া মানুষ যদি সংগ্রামে নামতে পারে, তাহলে আমি কেন বসে থাকব ঘরে। একদিন তো মরতে হবেই। তাই মৃত্যুর ভয় করে স্বার্থপরের মতো ঘরে বসে না থেকে 'সংগ্রামে নেমে গুলি খেয়ে বীরের মতো মৃত্যুও অধিক শ্রেষ্ঠ'। যে অন্যের জন্য নিজের জীবনকে বিলিয়ে দেয়, সেই প্রকৃত মানুষ। আমি যদি বেঁচে না ফিরি, তবে কষ্ট না পেয়ে গর্বিত হইয়ো। জীবনের প্রতিটি ভুলের জন্য ক্ষমা চাই।'

এই চিঠিটার মধ্যে তোমরা এখন অনুপ্রেরণা খোঁজার চেষ্টা করছ। এটা ভালো। দেশকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তোমাদের সকলের জেগে থাকতে হবে। বুকের মধ্যে সাহস সঞ্চয় করে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই সব বাঁধা নিমেষে বালির বাঁধের মতো ধ্বসে যাবে।

৫ই আগস্ট ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এরিয়ায় চাঁনখারপুল এলাকায় লংমার্চে যোগ দেই আমি। স্বৈরাচারী সরকারের নির্দেশে আন্দোলনকারী সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর গুলি চালায় পুলিশ। তিনটি গুলি এসে লাগে আমার মাথায় ও বুকে। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর পরই আমার মৃত্যু হয়।

দেশকে স্বৈরাচারের হাত থেকে মুক্ত করতে জীবন দিয়েছি আমি। আমার মতো আরও অনেক সাহসী বাংলার দামাল ছেলেও জীবন দিয়েছে। এখন দূরে থেকে আমার সম্পর্কে অনেক কথাই শুনছি আমি। বলা হচ্ছে– আনাসদের মতো সাহসী, দেশপ্রেমিক ও আত্মত্যাগ করা শহিদদের জীবনের বিনিময়ে পতন হয়েছে স্বৈরাচারের, দ্বিতীয়বারের মতো স্বাধীন হয়েছে দেশ। সে হয়ত কেবল একজন কিশোর ছিল, কিন্তু তার হৃদয়ে বহন করছিল সেই বিপ্লব, যা তার দেশের প্রয়োজন ছিল, সে এই বাংলাদেশের সাহসিকতার এক গর্বিত উদাহরণ।

আনাসের আত্মত্যাগ শুধু স্বাধীনতার মূল্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয় না, বরং সেই সাহসের কথাও বলে– যা সব বাধার মধ্যেও মানুষকে অধিকার আদায়ের জন্য দাঁড় করায়। তার সাহস প্রমাণ করে যে, একটি প্রজন্মের দৃঢ়তা, যারা কখনোই বল-প্রয়োগে চুপ করে থাকেনি। আনাস হয়ত নিজেদের বিজয় দেখে যেতে পারেনি, কিন্তু তার মতো হাজারও শহিদ ও আহতদের কারণে আজ একটি স্বৈরাচারমুক্ত বৈষম্যহীন ও স্বাধীন দেশ অর্জিত হয়েছে।

যা হোক, আজকের এই চিঠিটাও অনেক বড়ো হয়ে গেল। তবু অনেক কথা জমা রইল। সামনে সময়-সুযোগ করে আবারও নিশ্চয়ই এভাবে জানাবার চেষ্টা করব। শেষকথা একটাই বলব- তোমরা জেগে থেকো। তোমাদের দিকেই তাকিয়ে থাকে দেশ-সমাজ-বিশ্ব। তোমরা জেগে থাকলে ভালো থাকবে দেশ-সমাজ-বিশ্ব। ❑

প্রকাশনা বিভাগ, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

গল্প

দেয়ালের ছবি

পল্লব শাহরিয়ার

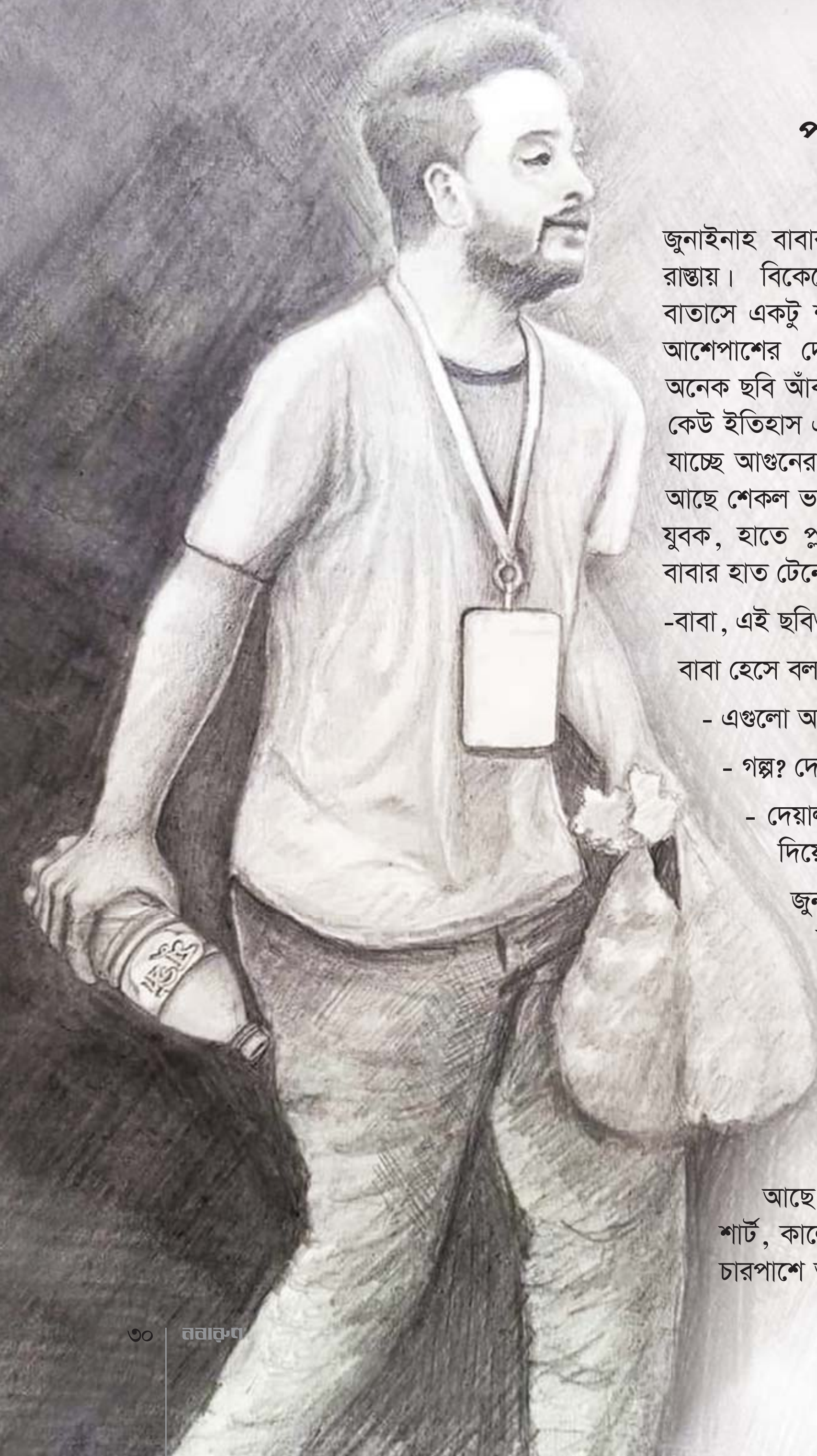

জুনাইনাহ বাবার হাত ধরে হেঁটে চলেছে ঢাকার রাস্তায়। বিকেলের রোদ নরম হয়ে এসেছে, বাতাসে একটু শীতলতা। তারা হাঁটছে ধীরে ধীরে আশেপাশের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে। দেয়ালে অনেক ছবি আঁকা, বিশাল বিশাল দেয়াল জুড়ে যেন কেউ ইতিহাস এঁকে রেখেছে। একটা দেয়ালে দেখা যাচ্ছে আগুনের শিখা, যেখানে কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে আছে শেকল ভাঙার ভঙ্গিতে। আরেকটাতে একদল যুবক, হাতে প্ল্যাকার্ড। জুনাইনাহ হাঁটতে হাঁটতে বাবার হাত টেনে ধরল।

-বাবা, এই ছবিগুলো কীসের?

বাবা হেসে বললেন,

- এগুলো আমাদের দেশের গল্প, সোনা!

- গল্প? দেয়াল কি কথা বলতে পারে?

- দেয়াল কথা বলতে পারে, যদি তুমি মন দিয়ে শোনো।

জুনাইনাহ বিস্মিত চোখে দেয়ালগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। এভাবেই দেয়াল দেখতে দেখতে এক দেয়ালের সামনে এসে থেমে গেল জুনাইনাহ। ছবিটা একটু আলাদা। এখানে আগুন নেই, মিছিল নেই, কেউ শেকলও ভাঙছে না। ছবিটাতে এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে পানির বোতল। সাদা শার্ট, কালো প্যান্ট, গলায় ঘামের দাগ। তার চারপাশে অনেক মানুষ, তৃষ্ণার্ত মুখে তাকিয়ে

আছে তার দিকে। ছবিটার নিচে কিছু লেখা আছে, কিন্তু জুনাইনাহ সেটা পড়তে পারছে না।

- বাবা, এখানে কী লেখা?

বাবা ছবিটার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর গভীর গলায় বললেন,

- এখানে লেখা আছে, 'সে শেষ পর্যন্ত সবার তৃষ্ণা মিটিয়ে গেছে'

জুনাইনাহ অবাক হয়ে তাকালো বাবার দিকে।

- মানে?

বাবার চোখে গর্বের আভা। তিনি ধীরে ধীরে বললেন,

- তার নাম ছিল মুগ্ধ। মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ। সে শুধু নিজের কথা ভাবত না, মানুষের কথাও ভাবত। ১৮ই জুলাইয়ের সকাল। আকাশ পরিষ্কার, কিন্তু বাতাসে যেন অস্থিরতা। চারদিকে উত্তেজনা। ঢাকার রাস্তাগুলো লোকে লোকারণ্য। সবাই নেমেছে ন্যায়ের দাবিতে।

সকালে মুগ্ধ খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠলেন। তিনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শার্টের বোতাম লাগাচ্ছিলেন। তার যমজ ভাই স্নিগ্ধ পাশ থেকে বলল,

- কীরে, তুই যাচ্ছিস?

- হ্যাঁ, সবাইকে তো পানি দিতে হবে।

- সাবধানে থাকিস, প্লিজ!

মুগ্ধ শুধু হেসে বলল,

- মানুষের জন্য দাঁড়ানোটা কখনোই ভুল না, ভাই!

তারপর ব্যাগে বোতল ভর্তি পানি নিলেন, বিস্কুট নিলেন, আর বেরিয়ে গেলেন রাস্তায়।

আজমপুরের মোড়ে এসে দাঁড়াতেই সে দেখল, হাজার হাজার মানুষ বসে আছে রাস্তায়। কারও মুখে স্লোগান, কারও কপালে ঘাম। গরমে সবার গলা শুকিয়ে এসেছে। মুগ্ধ ব্যাগ থেকে বোতল বের করে বলল,

- ভাই, পানি নেবেন?

একজন বৃদ্ধ কাঁপা কাঁপা হাতে বোতল ধরলেন।

- ধন্যবাদ, বাবা।

একজন তরুণ বিস্কুট নিতে নিতে বলল,

- আপনি নিজেও খান কিছু, ভাই।

মুগ্ধ হেসে বলল,

- আগে তোদের খাওয়াই!

সে একের পর এক মানুষকে পানি দিয়ে যাচ্ছিল। একটুও ক্লান্তি নেই চোখে, শুধু একরাশ ভালোবাসা। তখনই হঠাৎ পেছন থেকে একটা গর্জন উঠল- 'পুলিশ এসেছে! পিছিয়ে যান!' চারদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে গেল। পুলিশ সরাসরি গুলি ছুঁড়ল জনতার দিকে। একটি গুলি উড়ে এসে মুগ্ধের মাথায় লাগল।

সে ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল। পানির বোতলটা হাত থেকে গড়িয়ে গেল রাস্তায়, ঢাকনার মুখ খোলা, পানি মাটিতে মিশে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। চারপাশের চিৎকার আর কান্নার মধ্যে মুগ্ধের চোখ ধীরে ধীরে বন্ধ হতে লাগল। তার কানে তখনও ভেসে আসছিল মানুষের স্লোগান- 'স্বাধীনতা! ন্যায় বিচার!' তার চোখের সামনে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছিল বাতাসে।

'আমরা কি পারব?'

'মানুষের পাশে দাঁড়ানো কি ভুল ছিল?'

তার ঠোঁট নড়ল, কিন্তু শব্দ বের হলো না।

সে শুধু ভাবল- বাংলাদেশ একদিন ঠিকই জিতবে।

তারপর সব অন্ধকার হয়ে গেল।

বাবা গল্প বলা শেষ করলেন। জুনাইনাহ ছবিটার দিকে আবার তাকালো। ছেলেটার হাতে এখনও পানির বোতল, মুখে এক স্নিগ্ধ হাসি। সে ফিসফিস করে বলল, - বাবা, মুগ্ধ ভাইয়া কি সত্যিকারের হিরো ছিল?

বাবা গভীর মমতায় বললেন,

- হ্যাঁ, সোনা। হিরো মানেই এমন, যে অন্যদের জন্য ভাবে।

জুনাইনাহ দেয়ালের ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল। মনে মনে ভাবল, 'আমি কি বড়ো হয়ে মুগ্ধ ভাইয়ার মতো হতে পারব?'

বাতাসে তখনও একটা প্রতিধ্বনি বাজছে- 'সে শেষ পর্যন্ত সবার তৃষ্ণা মিটিয়ে গেছে'। ❑

গল্পকার

মায়া ও মুক্তি

রহিমা আক্তার মৌ

সেপ্টেম্বরের গোধূলি। রেজিস্ট্রার অফিস থেকে বের হয়ে ছোটো একটা ভিডিও করে মায়া। ভিডিওতে বলে,

'আজ থেকে আমি মুক্ত, একমুঠো মাটির অধিকার থেকে আমি মুক্ত। আজ থেকে বাংলার বুকের সব মাটিই আমার মাটি।'

আশেপাশে যারা ছিল তারা পুরো অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মায়ার দিকে। কিন্তু মায়া খুবই উৎফুল্ল এখন। অথচ মায়ার জায়গায় অন্য কেউ থাকলে গম্ভীর মুখ করে বের হতো। এই জন্মভূমির বুকে যেটুকু মাটি ওর নামে ছিল সেটুকু আজ অন্যের নামে। দীর্ঘ সাড়ে তিন মাসের একটা অনিশ্চিত দৌড়ের অবসান হলো আজ।

ভিডিও করা শেষ করে নিজের টাইমলাইনে শেয়ার করে রিকশা ডাকে। এখান থেকে সোজা যাবে হাসপাতালে। মাত্র সাত মিনিটের পথ যেন সাত ঘণ্টায়ও পার হচ্ছে না। ভাবনাগুলো কোথা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছে। খুব সকালে দুটো ডিম খেয়ে বাসা থেকে বের হয় মায়া। শরীরের এনার্জি ভালো রাখার জন্যেই দুটো ডিম খাওয়া। বাসা থেকে বের হওয়ার সময় কত কী ভেবেছে তার শেষ নেই। আজ ওর অনেক দায়িত্ব পালন করতে হবে। যাদের সাথে কাজ করবে তারা ওর নীতির উল্‌টো জগতের মানুষ, তাও আজ ঠিকভাবে দায়িত্ব

পালন করতে হবে। ব্যাংকের ঋণ, ব্যক্তিগত ঋণ শোধ করতেই হবে আজ তাকে।

গত কয়েকদিন আগে চারজনকে চারটা চেক দিয়েছে তারিখ বিহীন। তারিখ বিহীন চেকের জন্য বিপদেও পড়তে পারে। তবুও দিয়েছে। বাস থেকে নেমে রিকশায় সাব রেজিস্ট্রার এর অফিসের সামনে। এসে দেখে লেখকের অফিসে তখনও তালা মারা। পাশে এক মাসির দোকানে বসে দুইকাপ চা খেলো। কেউ কেউ আসতে দিনের দুইটাও বাজিয়েছে।

মায়ার ঘাম ঝরছে সবার আসতে দেরি দেখে। সবার সামনে কিছু বলতেও পারে না দলিল লেখককে। মোবাইলে ম্যাসেজ পাঠায়,

'একাউন্টে টাকা না ঢুকলে আমি কিন্তু স্বাক্ষর দিবো না। আজকের দিনের অফিস সময় শেষের দিকে। দরকার হয় পরের দিন রেজিষ্ট্রেশন দিবে।'

লেখক মায়ার কথার সাথে একমত হয়ে 'ওকে' লিখে পাঠায়। সকাল থেকে এই গোধূলির মাঝে দুইবার গিয়েছে হাসপাতালে। দেখে এসেছে তার বোন ছায়াকে। ছায়ার জন্য খাবার নিয়েছে, কিন্তু নিজের জন্য কিছুই কিনেনি। এই কয়েক ঘণ্টার মাঝে শুধু এক কাপ র'চা আর এক প্যাকেট মিনি পটাটো বিস্কুট। টেনশনে যেন গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। তার উপরে প্রচণ্ড গরম। সারাদিনে তেমন পানিও খায়নি। পানি কম খাওয়ার প্রভাব দেখা দিবে সন্ধ্যার পরেই। রিকশার টুনটুন শব্দই শুনছে, কিন্তু আগায় না। এত ক্লান্ত যে নেমে হাঁটবে তার সাহস পায় না। তাই বসেই আছে রিকশায়, ডুবে আছে ভাবনায়।

জুন মাসে জরুরিভাবে মিনুর জন্য এগারো লাখ টাকা পাঠাতে হয়। যখন তাদের কাছে ছিল না দশ হাজার টাকাও। শুধু মাত্র মায়ার মুখের কথায় টাকা দিয়েছে এজাজ। এমন অল্প সময়ে এজাজের এই উপকার মায়া কোনোদিন ভুলবে না। টাকা পাঠানোর পর মায়া এজাজকে কথা দিয়েছে, ওর নামের মাটিটুকু যতদ্রুত সম্ভব বিক্রি করে ঋণ শোধ করবে। মাটি বিক্রির কথা শুনলেই কেউ না কেউ এসে আধিপত্য দেখায়। এখানে সেখানে ওখানে শুধু খোঁজ লাগাচ্ছে মাটিটুকু বিক্রি করে ঋণ মুক্তির। জুলাইয়ের ১৫ তারিখ মায়া ঢাকা মেডিকেল যায় পারিবারিক কাজে। কাজ সেরে রিকশায় মেট্রোরেলের বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনে আসে। পুরো টিএসসি কাঁপছে ছাত্রদের মিছিলে। রিকশায় পুরোটা আসা যাবে না ভেবেই একটু দূরে নেমে যায়। হেঁটে স্টেশন আসতে মিছিলের মাঝে পড়ে যায়। এক পর্যায়ে পড়েই যায়, অন্য কারো আঘাতে পায়ে ব্যাথা পায়। সেদিকে তাকানোর সময় নেই। শুধু জীবন নিয়ে দৌড়ে আসে স্টেশনের উপরে। ছাত্রদের আন্দোলন দেখে ইচ্ছে করে ওদের পাশে ছুটে যেতে। কিন্তু পরিবারের দায়িত্ব আর মাথার উপর ঋণের দায়।

বাসায় ফিরতে ফিরতে গ্রামের বাড়ি থেকে কল আসে হায়দার আকবরের। হায়দার মায়ার মাটিটা কিনতে চায়, কিন্তু কাগজপত্র কীভাবে দেখবে। মায়া কথা দেয় সে নিজেই যাবে সব নিয়ে। রাত পার করে সকালে উঠে ভূমি অফিস, সাবরেজিস্টার অফিসে গিয়ে আরো দুইটা কাগজ সংগ্রহ করে দুপুর দুইটায় বের হয়। মেট্রোরেলে মতিঝিল গিয়ে ১৫০ টাকায় জনপথের মোড়। এই রিকশায় যেতে তিনবার মিছিলের সামনে পড়ে। রিকশা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অতঃপর চারটায় পৌঁছায় জনপথের মোড়ে। চারটার বাস ধরে রাত নয়টায় বাড়িতে। প্রতি মুহূর্তে শুনছে দেশের কথা। এখানে সেখানে ওখানে মিছিল, আহত-নিহত শিক্ষার্থী আর আমজনতা। রাতটা কোনোরকম পার করে সকালে উঠে হায়দারের বাড়িতে।

প্রায় চার-পাঁচ ঘণ্টা মিটিং হায়দারের সাথে। মাটির কাগজপত্র নিয়ে আলোচনা। সব দেখে হায়দার মাটিটুকু কিনতে রাজি হয়। কাজ সেরে বাস স্টেশন আসতে আসতে বিকেল চারটা। আসতে আসতে কয়েকবার কল দেয় কাউন্টারে।

'বাস যাবে তো'?

১৭ই জুলাই উত্তপ্ত রাজধানীসহ সারা দেশ। মায়াসহ মাত্র পাঁচজন যাত্রী নিয়ে রওয়ানা দেয় বাস। অল্প যাত্রী দেখে প্রথম ভয়ও পায় মায়া। কারণ এত দূরের পথে এত কম যাত্রী নিয়ে গেলে নিজের নিরাপত্তা কতটুকু...

এদিকে মোবাইলে-ইউটিউবে পাচ্ছে দেশের খবর।

যে যেখান থেকে পারছে নেমে যাচ্ছে রাজপথে। আর ঋণের দায় মাথায় নিয়ে দৌড়াচ্ছে মায়া। ইচ্ছে করে চলে যেতে রাজপথে কিন্তু...

অতঃপর একটু পরেই বাসে উঠে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। পুরো বাসে নারী বলতে দুইজন, বাকি ৬ জন পুরুষ। ড্রাইভার-হেলপারসহ মোট ১০ জন মানুষ। সবাই মোবাইলে দেশের খবর নিচ্ছে। বাস ঢাকা-চট্টগ্রাম পথের বিশ্বরোড আসে রাত আটটায়। সামনের বাসগুলো ঘুরে আসছে দেখেই ড্রাইভার বুঝে যায় কিছু একটা হয়েছে। আসলেই তাই হলো, যাত্রাবাড়ী এলাকায় কয়েকটা বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। অনেক লোক আহত হয় শুধু এটুকু খবর পেয়ে বাস থেমে যায়। সামনে যে বাসগুলো গেছে তারাও পাগলের মতো ছুটে আসছে। এর মাঝে দুইজন যাত্রী নেমে যায়। অন্যরাও নেমে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতেই মায়া সেই ছেলে আর মেয়ের সাথে কথা বলে। মায়ার সাথে কেউ নেই। সিঙ্গেল কোনো পুরুষের সাথে যাওয়া ওর জন্যে মোটেও নিরাপদ নয়। পরিচয় হয়ে জানা যায় ওরা দেবর-ভাবি। বড়ো ভাই বিদেশ থেকে আসবে তাই ওরা রাজধানী আসছে।

মায়া ওদেরকে অনুরোধ করে বলে,

‘তোমরা যেভাবে যেদিকে যাবে আমাকেও সাথে নিবে। কোনো সিঙ্গেল পুরুষের সাথে গেলে আমার নিরাপত্তার অভাব হতে পারে।’

একটা সিএনজি নিয়ে তিনজন রওয়ানা দেয়। যেসব পথ কখনও ওরা দেখেনি সেসব পথ মাড়িয়ে চলছে সিএনজি। মোবাইলে খবর পাচ্ছে ঢাকার ভেতরে পথে পথে বাধা আর গণ্ডগোল। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এতদিন রাস্তায় আন্দোলন করলেও আগামীকাল অনেকগুলো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নামবে। মায়ার একটাই চিন্তা কী করে বাসায় ফিরবে। যদি মেট্রোরেলের লাস্ট ট্রেনটাও ধরতে পারে তাহলে আসা সম্ভব।

সিএনজি ঘুরতে ঘুরতে এসে থামে সহযাত্রীদের বাসার কিছু কাছে। একটা ভিন্ন শহর দেখছে মায়া। মাত্র ২৮-২৯ ঘণ্টার জন্য ও শহর ছেড়েছে তার মাঝে এত পরিবর্তন। সিএনজি থেকে নেমে একটা রিকশা নেয় মতিঝিল মেট্রোরেল স্টেশন। মায়ার টিকিটটা সাথেই ছিল। অনেক যাত্রী দৌঁড়াচ্ছে ট্রেন ধরতে। একহাতে ভ্যানিটি ব্যাগ অন্যহাতে কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে মায়াও দৌড়ায়। মাত্র মিনিট দেড় দেরি হলেই আর উঠতে পারত না মায়া শেষ ট্রেনে। উঠেই বাসায় কল দেয়। ট্রেন ছেড়ে দেয় গন্তব্যের দিকে। শাহবাগ ক্রস করার সময় সেই মিছিলের ডাক। ট্রেন থেকেই বুঝা যাচ্ছে থমথমে পরিবেশ। রাত ১১ টায় বাসায় আসে মায়া।

সকাল হলেই অনেকগুলো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নামবে রাস্তায়। সময় ঠিক হয় ১০টার পর। এদিকে মায়াকে যেতে হবে উত্তরায়। মায়ার বাসা থেকে উত্তরা যেতে তিনঘণ্টা সময় লাগার রেকর্ড আছে অতীতের। সেখানে সিএনজিতে মাত্র ২০ মিনিটে মায়া উত্তরায় পৌঁছায়। মনে হচ্ছে মায়া গলিতে প্রবেশ করছে আর পেছন থেকে দলে দলে আমজনতা তাড়া দিচ্ছে। উত্তরার পথঘাট রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। গুলিবর্ষণ, কাঁদানেগ্যাস। গলির ভেতরেও দেশি অস্ত্রসহ সরাসরি গুলি চালাচ্ছে একদল। ফুটপাতের সব ইট একটাও নেই জায়গায়। রাস্তার মধ্যখানে টায়ার জ্বালিয়ে আগুন। ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে পুরো আকাশ ধূসর হয়ে যায়।

অনেকটা গৃহবন্দি অবস্থায় মায়াসহ পরিবারের অন্যরা। সারাদিন ঘরের ভেতরেই টিয়ারসেলের ঝাঁঝালোতে জ্বলে যাচ্ছে সবার মুখ-হাত-শরীর। টিভির নিউজগুলোতে তেমন কিছুই দেখাচ্ছে না। ভরসা একমাত্র মোবাইল আর ইউটিউব চ্যানেলগুলো। তার উপরে সময় সময় ইন্টারনেটের স্লো। সন্ধ্যায় ঘোষণা আসে রাত ১২টা থেকে কারফিউ। মায়া ওর বিকাশ নাম্বার থেকে কয়েকটা শিক্ষার্থী ছোটো-ভাইবোনদের মোবাইলে রিচার্জ করে দেয়। তাও একসাথে পারে না। অপেক্ষা করতে করতে এরপর টাকা যায়।

'বন্ধ করে দেওয়া হলো দেশের ইন্টারনেট সেবা।'

সারা দেশের সাথে মানুষের যোগাযোগ বন্ধ প্রায়। ২০শে জুলাই দুপুরে মাত্র দুই ঘণ্টার জন্য কারফিউ শিথিল করলে সেই সুযোগে রিকশায় উত্তরা থেকে তেজগাঁও এর পথে মায়া।

মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি মায়া, বাবার মুখে শুনেছে। ওর বাবা একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। রাস্তার প্রতিটা জায়গায় ক্ষতের চিহ্ন। অপ্রয়োজনে একটা গাছের ডালপালা কাটলে যে মায়ার মনে কষ্ট লাগে সে দেখছে পুড়ে যাওয়া ভবন আর শতশত গাড়ি। কিছু কিছু ভিডিও করছে। আজ যদি ইন্টারনেট চালু থাকত হয়ত লাইভ করতে করতে ফিরত মায়া। পুরো দেশে যা হচ্ছে তা মানুষ যেন না জানতে পারে, প্রচার করতে না পারে তার জন্যেই ইন্টারনেট সেবা বন্ধ। মহাখালী আমতলী আসার আগেই পুলিশ রিকশা আটকে দেয়। বলে,

'মহাখালী গোলাগুলি হচ্ছে, রিকশা যাওয়া যাবে না, এমনকি মানুষও।'

তিন রিকশায় ওরা নারী পুরুষ ও শিশুসহ সাতজন। বাধ্য হয়ে নেমে যায়। কিন্তু কী করবে এখন ওরা? সামনে যাওয়া যাবে না, পেছনে অনিশ্চিত পথ...

হঠাৎ মাথায় আসলো গুলশান রোডের কথা। সবাইকে নিয়ে ঢুকে পড়ে আমতলী - গুলশান রোডে। তিনটা রিকশা নিয়ে ঘুরে ঘুরে নিজেদের গন্তব্যে।

সেই থেকে ৩রা আগস্ট একটা বিভীষিকাময় দিন। সুযোগ পেলেই বের হয়ে যায় মায়া, যেভাবে পারে কিছু হলেও কাজ করে। ৩রা আগস্ট বিকেলে বের হলেও শহিদমিনারের জনস্রোতের সাথে মিলিত হতে পারেনি। এই আফসোস নিয়ে নিজের টাইমলাইনে লিখে,

'আজকের ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী না হতে পারার আফসোস থেকে যাবে সারা জীবন।'

৪ঠা আগস্ট ২০২৪, এক চরম দিন জনগণের। একপক্ষে দেশের আমজনতা অন্যপক্ষ তৎকালীন সরকার আর তাদের পুলিশবাহিনী। একটা মুহূর্ত যেন টেনশন ছাড়া পার হচ্ছিল না মায়াসহ সবার। ৩রা

আগস্ট ঘোষণা হয় ৬ই আগস্ট সারা দেশ থেকে আমজনতা ঢাকায় আসবে, গণভবন ঘেরাও করবে। কিন্তু ৪ঠা আগস্টের একদিন এগিয়ে ৫ই আগস্ট করা হয়।

৫ তারিখ ভোর হলো। মায়া ঘরে থাকতেই পারছে না। শুধু মনে হতে লাগল কী যেন হয়ে যাচ্ছে, কী যেন হয়ে যাচ্ছে। বাধ্য হয়ে কারফিউ এর মাঝে বের বের হয়। গলায় একটা ব্যাগ, ব্যাগে কিছু টাকা আর মোবাইল। বের হয়ে একটা রিকশা ঠিক করে। চালককে বলে দেয় বিস্তারিত। কোনোভাবেই সে রিকশা থেকে নামবে না, রিকশাওয়ালাকেও একা ছাড়বে না।

তেজগাঁও থেকে বাংলামোটর, সোজা পথে শাহবাগ যেতে না পারায় পরিবাগের ভেতর দিয়ে শাহবাগ হয়ে মৎস ভবন। পথে পথে আটকে দেয় সেনাবাহিনী আর পুলিশ। যেখানে যা বলে ছাড়া পাওয়া যায় তাই বলেই মুক্তি পাচ্ছে। মৎস ভবন - প্রেসক্লাব- ঢাকা মেডিকেল হয়ে শাপলা চত্বর হয়ে ওদিকে না যেতে পেরে টিএসসিতে আসে। রাজপথে রাজাও নেই, নেই প্রজারাও। আছে শুধু সেনাবাহিনী আর সিবিল পোশাকের কিছু লোক। টিএসসি থেকে নিউমার্কেটের দিকে যেতে চাইলে মোটরবাইকে চড়া সিবিল ড্রেসের একজন মায়াকে থামিয়ে দেয়। নিউমার্কেটে গণ্ডগোল হচ্ছে জানায়। মায়া টিএসসি থেকে শাহবাগের দিকে আসতেই জাতীয় জাদুঘরের সামনে থামিয়ে দেয় সেনাবাহিনী। বারডেম হাসপাতালে যাওয়ার কথা বলে ছাড়া পায়। এরপর সোজা তেজগাঁও।

এই পুরোটা সময় ঘুরে মায়া বুঝতে পারে সাংঘাতিক কিছু একটা হতে যাচ্ছে, কিন্তু সেটা কী? দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন আসুক এটা চায় মায়াও। কিন্তু মায়া এটাও জানে রাজনীতিতে খেলা একই, শুধু

খেলোয়াড় বদলায়। সকাল থেকে রাজপথে মানুষ না থাকলেও ঢাকা শহরে অনেক মানুষ আছে যা বোঝা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ফিসফিসানি একটা হাওয়া ভাসছে।

একটার পর দুপুরের খাবার খেয়ে দিপুকে সাথে করে বের হয়। ততক্ষণে রাজপথে আমজনতা। কিন্তু তখনও বুঝতে পারছে না কী হতে চলেছে। শতশত মানুষের সাথে দিপুসহ তেজগাঁও থেকে শাহবাগের পথে। জরুরি প্রাকৃতিক কাজে বারডেম হাসপাতালে প্রবেশ করে মায়া। সেখানেই শুনতে পায় ঐতিহাসিক ঘোষণা। ততক্ষণে হাজার হাজার মানুষ শাহবাগে। পা ফেলার জায়গা নেই। জনসমুদ্র এখন সংসদ ভবন আর গণভবনের দিকে। জনস্রোতের সাথে ওরাও আসে সংসদের সামনে। দিপুর অনেক দিনের ইচ্ছে একবার হলেও সংসদের ভেতরে যাবে, হাঁটবে। সেদিন দিপুর সেই ইচ্ছেপূরণ হয়ে যায়।

৫ই আগস্ট বাংলাদেশের জন্য এক ঐতিহাসিক দিন রচিত হলো। দেশ সংস্কারের কাজ চলছে, মায়ার ভাবনা তার এক টুকরো মাটি আর ঋণের দায়। হায়দারের সাথে যোগাযোগ হচ্ছে। মায়ার ইচ্ছে ছিল ওই মাটিটুকু বিক্রি করে ঋণমুক্ত হবে আর মাটি বিক্রির অবশিষ্ট দিয়ে সামান্য সোনা কিনে গলায় পরবে। এই জীবনে গলায় সোনা উঠেনি। সেইভাবে পরিকল্পনাও করে। কিন্তু হায়দারের কথা শুনে মায়ার মাথায় বাজ পড়া অবস্থা। ওই মাটিটুকুর প্রকৃত মূল্য যা তার অর্ধেক দাম বলছে হায়দার। এই টাকায় মায়ার সব ঋণ শোধ হবার নয়, আর গলায় সোনা পরার স্বপ্ন তো দূরের কথা।

এদিকে এজাজকে দেওয়া কথা। উপায় না পেয়ে হায়দারের কথায় রাজি হয়। পুরো ঋণ শোধ না হোক অনেকটাই তো হবে। ঋণ মাথায় নিয়ে মরলেও যে শান্তি পাবে না মায়া। হায়দারের সাথে কথা ফাইনাল করে মায়া চারটা চেক দেয় পাওনাদারদেরকে। তবুও মায়ার চিন্তা দূর হচ্ছে না। যে পর্যন্ত টাকা বুঝে পেয়ে মাটির কাগজ তুলে দেওয়া হবে না সে পর্যন্ত মায়ার চোখে ঘুম নেই। গত একমাস কতটা সময় যে না ঘুমিয়ে রাত কাটিয়েছে সে শুধু মায়া নিজেই জানে। গত মধ্যরাতে ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় দাঁড়ায়। আকাশের সাদা মেঘের ভেসে বেড়ানো দেখে। ঠিকভাবে কাজ করতে পারলে মায়াও এমন করে মেঘের সাথে ভাসবে স্বপ্ন নিয়ে।

আনমনে গলায় হাত দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এই জীবনে হয়ত আর গলায় সোনা পরা হবে না। তাতে কী মায়া আজ ঋণমুক্ত। রিকশা এসে থামে হাসপাতালের সামনে।

‘আপা নামবেন না’ ?

রিকশাওয়ালার এমন কথায় ভাবনার জগৎ থেকে বাস্তবে আসে মায়া। দ্রুত ভাড়া দিয়ে হাসপাতালের উপরে উঠে যায়। ছায়ার ডায়ালসিস শেষ হয়েছে। ও বসে আছে মায়ার জন্য। মায়া দ্রুত উঠে যায় উপরে। ছায়ার হাত ধরে নামিয়ে নিয়ে আসে। রিকশায় উঠে।

‘কি রে মায়া সব কাজ হয়েছে?’

‘হ্যাঁ সব কাজ শেষ। আজ থেকে আমার ব্যক্তিগত কোনো মাটি নেই। বাংলার প্রতিটি মাটির টুকরো এখন থেকে আমাদের, আমার বলতে আর কিছুই নেই।’

‘খেয়েছিস’।

‘না’।

‘তুই তো বলেছিস কিছু খেয়ে নিবি’।

‘বলেছি, কিন্তু টেনশনে ছিলাম যে খুদা লাগেনি’।

‘অন্যরা খেয়েছে’?

‘সবাই খেয়েছে’।

সামনের রাস্তা পুরো ফাঁকা। ব্যাটারিচালিত রিকশা দ্রুত যাচ্ছে যেন হাওয়ায় উড়ছে। মায়া মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করছে। নিজেকে খুব হালকা অনুভব করে স্বাভাবিক করতে ছায়াসহ গান গাইতে থাকে।

আমার মুক্তি আলোয় আলোয়... ❑

সাহিত্যিক প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক

গল্প

বাবার অপেক্ষায়

সালাম ফারুক

মেয়ের চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল রাজিয়া বেগমের। কাছে টেনে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে দেখলেন, মেয়ের চোখে-মুখে আতঙ্ক। মা তার মনের অবস্থা বুঝলেন। কিছু না বলে কিছুক্ষণ বুকে জড়িয়ে ধরে রাখলেন। পিঠে হাত বুলাতে থাকলেন। 'আম্মু আছি, আম্মু আছি তো মা', 'তোমাকে কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না', 'তোমাকে কে কী বলেছে?', 'খারাপ স্বপ্ন দেখেছো? ওসব কিচ্ছু না'– ইত্যাদি বলে মেয়েকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। মনে মনে দোয়া ইউনুস, মেয়ের শরীরে ফু দিয়ে দিলেন। মায়ের বুকে মুখ গুজে থেকে ধীরে ধীরে আবারও ঘুমিয়ে পড়ল মেয়ে।

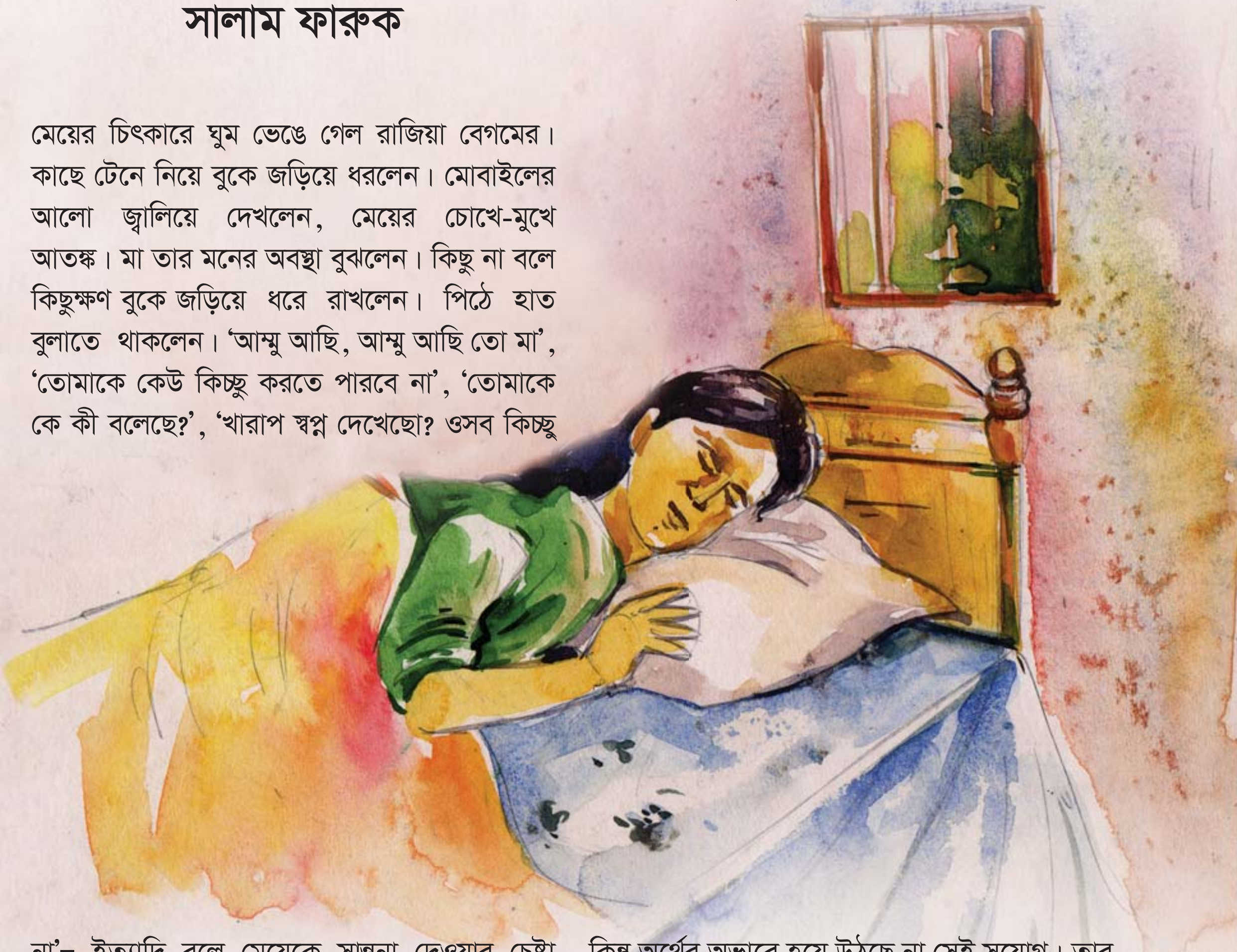

রাজিয়া বেগমের ৯ বছর বয়সি শিশুকন্যা নিসা এক মাস ধরে প্রায় রাতেই এমন ভয় পেয়ে জেগে ওঠে। কখনও আতঙ্কমাখা বদনে চুপচাপ বসে থাকে। আবার কখনও বা 'বাবা বাবা' করে কাঁদতে থাকে। মেয়ের এ ট্রমার বিষয়টি সহজেই বুঝতে পারেন মা। তাই বিরক্ত হন না। সাথে সাথে টের পেয়ে যান প্রতিবারই। বাবাকে হারানোর কষ্ট থেকে এখনও হালকা হতে পারেনি নিসা। তাই তো, দিনের বেলায়ও কোথাও মেয়েকে একা ছাড়েন না রাজিয়া। একজন ভালো সাইক্রিয়াটিস্টকে দেখানোর পরামর্শ দিয়েছেন আত্মীয়স্বজনরা। তিনিও সে কথা ভাবছেন। কিন্তু অর্থের অভাবে হয়ে উঠছে না সেই সুযোগ। তার ওপর মানসিকভাবে বিপর্যস্ত নিজেও।

জুলাইয়ে উত্তাল ছিল সারা দেশ। নিসার বাবা নাসিরুল ইসলামও ছিলেন সেই ছাত্র-জনতার কাতারে। বীর সাহসিকতায় প্রতিদিন দাঁড়িয়েছেন পুলিশের অস্ত্র আর গ্রেনেডের সামনে। বিশেষ করে, ১৬ই জুলাই রংপুরে পুলিশের গুলিতে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদের মৃত্যুর পর থেকে নিজেকে আর সামলে রাখতে পারেনি নাসিরুল। প্রতিদিন

রাজপথে ছাত্র-জনতার কর্মসূচিতে সোচ্চার উপস্থিতি ছিল একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করা এ তরুণের। অফিসে হাজিরা দিয়েই বেরিয়ে পড়তেন পথে। স্লোগানে স্লোগানে কাটিয়ে দিতেন সারা দিন।

দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী নিসা মায়ের মুঠোফোনে প্রায়ই আন্দোলনের ভিডিও দেখত। তখন থেকেই রাতে ভয়ে জেগে ওঠা শুরু। কোনো কোনো রাতে দু'তিনবারও চিৎকার করে উঠত। রাজিয়া বেগম এখন বুঝতে পারেন, মেয়ের হাতে মোবাইল দিয়ে ঠিক করেননি তিনি। নিজের কাজের ব্যস্ততার কারণে মেয়েকে বেশি সময় দিতে পারতেন না। তাই মোবাইল হাতে নিলেও খুব একটা বারণ করতেন না তিনি।

জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের সময়টায় দেশজুড়ে সহিংসতার দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এতটাই ছড়িয়েছে যে, তাতে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষমাত্রই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছেন। আর কোমলমতি শিশুদের বেলায় তো এর মাত্রা আরও ভয়াবহ। নিসার ক্ষেত্রে তা-ই ঘটেছে।

প্রতিদিনই বাসা থেকে বের হওয়ার সময় বাবাকে জড়িয়ে ধরত নিসা। যেতে মানা করত। বলত, 'বাবা তোমাকেও যদি ওরা মেরে ফেলে আমি কাকে বাবা বলে ডাকব?' নাসিরুল ইসলাম তাকে অভয় দিয়ে বলতেন, 'ভয় পাসনে মা। আমার কিচ্ছু হবে না। দিন শেষে আবারও এসে পড়ব বাসায়।' মেয়ের মন মানে না। চোখ মুছতে মুছতে বিদায় জানায় বাবাকে। শুধু কি নিসা? স্ত্রী রাজিয়ার বাধাও উপেক্ষা করেন নাসিরুল। অধিকার আদায়ের এ আন্দোলনে যে তাকে যেতেই হবে। প্রতিদিন তার ফেরার প্রতীক্ষায় থাকেন রাজিয়া বেগম ও নিসা।

৩রা আগস্ট। দিন পেরিয়ে রাত গড়ায়। বাবা আসে না। নির্ঘুম নিসা। ঝুল বারান্দা থেকে পথের পানে চেয়ে চেয়ে সময় কাটে রাজিয়ার। চারপাশে মুহুর্মুহু গুলি আর গ্রেনেডের শব্দ। একটু পরপর নিসা ডাকে, 'মা, বাবা এখনও আসে না কেন? ও মা, ও মা, বাবা কোথায়? একটা কল দাও না।' রাজিয়া কি আর কল না দিয়ে বসে আছেন? কিছুক্ষণ পরপরই দিচ্ছেন। কিন্তু ওপাশ থেকে মিলছে না সাড়া। এবার

মেয়ে তার হাত থেকে কেড়ে নিল মোবাইল। বারবার বাবার নম্বরে ডায়াল করে চলেছে। এভাবে ঘণ্টাখানেক ধরে চেষ্টা করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে মা সেটা খেয়াল করেননি। অনেকক্ষণ মেয়ের শব্দ না পেয়ে বারান্দা ছেড়ে ছুটে গেলেন ভেতরে। দেখলেন, মেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। গাল আর নাকের ওপর চোখ বেয়ে পড়া অশ্রুর শুকিয়ে যাওয়া দাগ।

মশারিটা টানিয়ে মেয়ের গায়ে একটা কাঁথা জড়িয়ে দিয়ে আবার বারান্দায় চলে আসেন রাজিয়া। স্বামীর টেনশনে বুকের ভেতরে চলছে তোলপাড়। তার কিছু হয়ে গেলে মেয়েকে নিয়ে কোথায় যাবেন তিনি? একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাতছানি তাড়া করতে থাকে তাকে। নাহ, রাত পেরিয়ে দিন চলে এলো। আবার দিন পেরিয়ে রাত। ৫ই আগস্ট চূড়ান্ত বিজয় এলো আন্দোলনে। কিন্তু ঘরে এলেন না নিসার বাবা। এরপর সপ্তাহ গড়িয়ে শেষ হলো আগস্ট মাসও। তবুও ফেরা হয়নি নাসিরুলের।

বাবাকে হারানোর ব্যথা প্রতিটি ক্ষণেই যেন কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল নিসাকে। প্রতি রাতে ঘুমের মধ্যে বাবাকে স্বপ্নে দেখে চিৎকার করে ওঠে সে। স্বামীকে হারিয়ে দিশেহারা রাজিয়া বেগম একমাত্র মেয়েকে নিয়ে ঢাকা ছেড়ে গ্রামের বাড়ি কুমিল্লা চলে এলেও এখনও স্বাভাবিক হতে পারেনি নিসা। বাবার কিনে দেওয়া পুতুলটা সারাক্ষণেই কোলে নিয়ে রাখে। কারও সাথে ভালোভাবে কথা বলে না। কেউ কুশল জিজ্ঞেস করলেই জানতে চায়– বাবা কবে ফিরবে? গ্রামের অন্য বাচ্চারা খেলার জন্য ডাকলেও যায় না সে। তাদেরকে সে শর্ত দেয়– 'যদি আমার বাবাকে এনে দিতে পার, তোমাদের সাথে খেলতে যাব'। গ্রামের মানুষ, আত্মীয়স্বজন অনেকেই আসেন তাদের খোঁজ খবর নিতে। সবার কাছে নিসার একটাই কথা– 'আমার বাবাকে দেখেছো? বাবাকে এনে দাও না। বাবাকে এনে দিলে এই পুতুলটা তোমাকে দিয়ে দেবো।' বাবার কিনে দেওয়া প্রিয় পুতুলটার বিনিময়ে হলেও সে বাবাকে ফিরে পেতে চায়। তার এসব প্রশ্ন আর আব্দারে সবাই নিশ্চুপ থেকে আড়ালে শুধু চোখের জল ফেলেন।

প্রতিদিন অফিস থেকে ফেরার পথে মেয়ের জন্য এটা-সেটা নিয়ে আসতেন নাসিরুল। কখনওবা চকলেট, কখনও আইসক্রিম, আবার কখনও মেয়ের পছন্দের কোনো খাবার। বলতে গেলে, মেয়ের কোনো চাওয়াই রাখতেন না অপূর্ণ। ঘরে ঢুকেই মেয়েকে জড়িয়ে ধরতেন। একমাত্র সন্তান, তাই আদরের মাত্রাটাও ছিল বেশি। তাই তো বাবাকে আজও এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারে না নিসা।

একদিন তাকে দেখতে ও পড়ালেখার খোঁজখবর নিতে এলেন পাশের গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শওকত হোসেন। নিসাকে তার স্কুলে ভর্তি করানোর আগ্রহ দেখালেন। কিন্তু নিসার একটাই কথা– তার বাবা না এলে সে স্কুলে যাবে না। শওকত সাহেব তাকে বলেন, তোমার বাবা আমাদের এ গ্রামের গর্ব। তিনি দেশের একজন বীর সন্তান। তার মেয়ে হিসেবে তুমি আমাদের স্কুলে ভর্তি হলে সবাই আদর করবে, ভালোবাসবে।

মাস্টার সাহেবের কথা শুনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে নিসা। আর অন্যদিকে নিসার মা রাজিয়া বেগম ও দাদা কবিরুল ইসলামের চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে থাকে। পকেট থেকে ১০০ টাকা বের করে নিসাকে দেন শওকত স্যার। বলেন, এটা দিয়ে কিছু কিনে খেও তুমি। মনে করো, তোমার বাবাই আমাকে দিয়ে পাঠিয়েছেন। বলেই চোখ মুছতে মুছতে ফিরে গেলেন তিনি।

নিসাকে কোলে টেনে নেন দাদা। নাসিরুলের শৈশবের কথা মনে পড়ে যায় তার। হারিয়ে যান স্মৃতির পাতায়। এ স্কুলেই হাতেখড়ি ছিল তার একমাত্র ছেলের। প্রথম ক্লাসে তাকে হাত ধরে নিয়ে গেলেও পরে সে একাই যাওয়া-আসা করত। ভালো ছাত্র ছিল। স্কুলের শিক্ষকরাও তাকে ভালোবাসতো। এখন তার মেয়েও পড়বে একই স্কুলে। শহরের নামিদামি স্কুলে পড়ানোর খুব সাধ ছিল মা-বাবার। কিন্তু নিয়তি তাকে তার বাবার স্কুলেই নিয়ে এসেছে। ❑

বার্তা সম্পাদক, আরটিভি, বিএসইসি ভবন, কারওয়ান বাজার

গল্প

মেঘ, পাখি আর ঘুড়িটি

খায়রুল বাবুই

‘অ্যাই পুঁচকে ঘুড়ি, একা একা কোথায় যাচ্ছ?’

‘কে? কে কথা বলল!’

উড়তে উড়তেই আড়চোখে বামে তাকায় ঘুড়িটি। দেখল একটি পাখি। বড়ো বড়ো দুটি ডানা। পাখিটির নাম যেন কী? উঁ-উঁ-উঁ, মনে পড়ছে না। আগে কি কোথাও দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে? উঁহু, সেটাও মনে করতে পারল না।

‘কী ভাবছ? কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন?’ পাখির কণ্ঠে হালকা বিরক্তি।

‘তোমাকে তো চিনতে পারছি না। তুমি কে?’ উলটো প্রশ্ন করল ঘুড়ি।

‘আমার নাম ঈগল।’

‘বলো কি?’ আঁতকে ওঠে ঘুড়ি, ‘তুমিই ঈগল!’

‘আশ্চর্য! এরকম আঁতকে ওঠার কী আছে?’ ঘুড়িকে আশ্বস্ত করল ঈগল, ‘আমার নাম শুনে শুধু শুধু অনেকেই ঘাবড়ে যায়। কিন্তু আমি খুব ভালো পাখি। আমাকে বন্ধু ভাবতে পারো।’

‘মোটেই না।’ ঘুড়ি মাথা নাড়ায়, ‘বন্ধু ভাবা তো পরের কথা, মা বলেছেন অপরিচিত কারও সঙ্গে কথাই না বলতে।’

‘আরে, তোমার ভালোর জন্যই বলছি।’ নরম কণ্ঠে ঈগল বলল।

নাহ্, পাখিটির কথা শুনে তো তেমন খারাপ বলে মনে হচ্ছে না। মনে মনে ভাবল ঘুড়ি।

‘তা, তোমার নাম কী?’ ঈগল জানতে চায়।

‘ফাইটার।’

‘হা হা হা।’ শব্দ করেই হেসে উঠল ঈগল। ‘তা ছোট্ট ফাইটার, একা একা উড়ছ কেন? তোমার সঙ্গে বড়ো কাউকে দেখছি না যে?’

ফাইটার বলল, ‘মায়ের সঙ্গেই উড়ছিলাম। হঠাৎ দেখি আমি একা হয়ে গেছি।’

‘ওহ! মন খারাপ কোরো না ছোট্ট বন্ধু। টেনশনও কোরো না।’ ঈগলের কণ্ঠে অভয়ের সুর।

‘আজব। মন খারাপ করব কেন? একা একা উড়তে তো আমার ভালোই লাগছে।’ ফাইটার বলল, ‘কী বিশাল আকাশ। নিচে মাটি, সবুজ গাছপালা আর নদী। উপরে দলবেঁধে সাদা মেঘও উড়ে বেড়াচ্ছে, আমার মতোই স্বাধীনভাবে। আরেকটু উপরে উঠতে পারলে অবশ্য ভালো হতো। মেঘগুলোকে ছুঁয়ে দেখতে পারতাম।’

‘উঁহু, সেটা আর সম্ভব না।’ মাথা নাড়ালো ঈগল, ‘তুমি আজকে আর মেঘ ছুঁতে পারবে না।’

‘কেন?’ অবাক চোখে বলল ফাইটার।

‘কারণ তুমি এখন ভোকাট্টা ঘুড়ি।’ ঈগল বলল, ‘আরেকটা ঘুড়ির সঙ্গে লেগে সুতো ছিঁড়ে গেছে তোমার।’

‘অ্যাঁ!’ কথাটা শুনেই কেমন যেন চমকে উঠল ফাইটার। আড়চোখে পেছনে তাকালো। দেখল, সত্যিই, সুতো নেই! হায় হায়!

ঠিক তখনই গুড়-গুড়-গুড়ুম শব্দে যেন কানে তালা লেগে গেল ফাইটারের। আচমকা বজ্রপাত। কোত্থেকে যেন দলেবলে কালো মেঘ এসে ভিড় করেছে ওদের মাথার ওপর। বাতাসও গুমোট হতে শুরু করেছে।

এদিক-ওদিক দুলতে দুলতে অসহায় দৃষ্টিতে ঈগলের দিকে তাকালো ফাইটার, ‘অ্যাই, আমি তাল সামলাতে পারছি না। এখন কী হবে?’

‘কী আর হবে, তোমার নাম ফাইটার। বাতাসের সঙ্গে ফাইট করতে করতে তুমি এখন শুধু নিচের দিকেই নামবে।’

‘বলো কি!’ ফাইটারের চোখে-মুখে আতঙ্ক।

‘হুঁ। আর বৃষ্টি শুরু হবে এখনই।’

‘কিন্তু এভাবে নামতে থাকলে তো মাটিতে পড়ে ব্যথা পাবো।’ ভয়ার্ত কণ্ঠে ফাইটার বলল।

‘আমি থাকতে টেনশন নেই ছোট্ট বন্ধু।’ বলতে বলতেই দ্রুত নিজের দুটি ডানা ঝাপটালো ঈগল।

ফাইটার কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখল ঈগল তার আশেপাশে নেই। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল সে, ‘আরে, কোথায় গেলে তুমি? মাত্রই না বললে আমাকে বন্ধু বানাবে। আমাকে হেল্প করবে। তাহলে কি মিথ্যা বলেছ? ঈ-গ-ল’

অভিমান আর কষ্টে চোখ ফেটে কান্না এল ফাইটারের। জোরে বাতাস বইতে শুরু করেছে। নিয়ন্ত্রণহীন এলোমেলোভাবে ভাসতে লাগল সে। বুঝতে পারল, মাটিতে আছড়ে পড়ে ছিন্নভিন্ন হতে আর বেশি দেরি নেই।

ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল ফাইটার। সাঁই সাঁই করে নামছে তো নামছেই। নামছে তো নামছেই।

নামতে নামতে হঠাৎ থেমে গেল।

কী হলো? চোখ বন্ধ অবস্থায়ই ফাইটার ভাবল, সে কি আর বেঁচে নেই? মাটিতে পড়েই মরে গেছে? কিন্তু একটুও ব্যথা পেল না যে। এটা কীভাবে সম্ভব?

তখনই কানে ভেসে এল বাক্যটি, ‘চোখ খোলো ছোট্ট বন্ধু। আর ভয় নেই।’

আরে, কণ্ঠটা তো পরিচিত। ঈগলের কণ্ঠ। ফাইটার ভয়ে ভয়ে চোখ খুলল। দেখল, সে মাটিতে নয়, এখনও ধীরলয়ে উড়ছে। ঈগলটি নিজের পিঠের ওপর বসিয়ে নিয়েছে তাকে। বাতাসের ঝাপটা লাগছে শরীরে। স্বস্তিতে হাফ ছাড়ল ফাইটার। অথচ একটু আগেই ঈগল সম্পর্কে কী ভুল ধারণাটাই না করেছিল সে। ভেবে খুব লজ্জা পেল।

‘দুঃখিত ঈগল, তোমাকে কিছুক্ষণের জন্য ভুল বুঝেছিলাম।’ ফাইটার বলল, ‘ভেবেছিলাম তুমি আমাকে বিপদের মধ্যে রেখে চলে গেছ।’

‘আমি তোমাকে বন্ধু ভেবেছি। বন্ধুকে বিপদে ফেলে

রেখে চলে যাওয়ার মতো পাখি আমি না। বুঝেছ?'

উত্তরে কী বলবে ভেবে পেল না ফাইটার। এরই মধ্যে বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে।

'কী হলো, কিছু বলছ না যে?' ঈগল উচ্চস্বরে বলল, 'এখনই জোরে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হবে। আমরা মাটির কাছাকাছি চলে এসেছি। তুমি কোথায় যাবে বলো, পৌঁছে দেবো।' 'বুঝতে পারছি না কোথায় যাব।' দ্বিধাজড়িত কণ্ঠ ফাইটারের।

'তাহলে চলো, আমার বাসায় নিয়ে যাই তোমাকে।' ঈগল বলল, 'ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেলে তারপর না হয় তোমাকে তোমার মা-বাবার কাছে পৌঁছে দেবো।'

'ঠিক আছে বন্ধু। তাহলে সেটাই করো।' সঙ্গে সঙ্গে সায় জানালো ফাইটার।

'বন্ধু!' ঈগল মুচকি হেসে বলল, 'তুমি আমাকে বন্ধু হিসেবে মেনে নিয়েছ?'

উত্তরে কিছুক্ষণ চুপ থাকল ফাইটার। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হুঁ। আজ থেকে তুমি আমার সত্যিকারের বন্ধু। তোমার মনটা আকাশের মতোই বড়ো।'

'ঠিক আছে বন্ধু। খুব খুশি হলাম। এখন তুমি সাবধানে বসো। ঝড় শুরু হওয়ার আগেই বাসায় পৌঁছাতে হবে।'

গাছপালার ওপর দিয়ে দ্রুত নিজের বাসার উদ্দেশ্যে উড়তে থাকল ঈগল। ফাইটার শক্ত করে ঈগলের দুটি ডানা ধরে রাখল। তার চোখে জল। এই জল মেঘ ভেঙে আসা বৃষ্টির নাকি বিপদের বন্ধু ঈগলের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধের-তা জানে শুধু ছোট্ট ভোকাট্টা ঘুড়িটিই। ❑

শিশুসাহিত্যিক

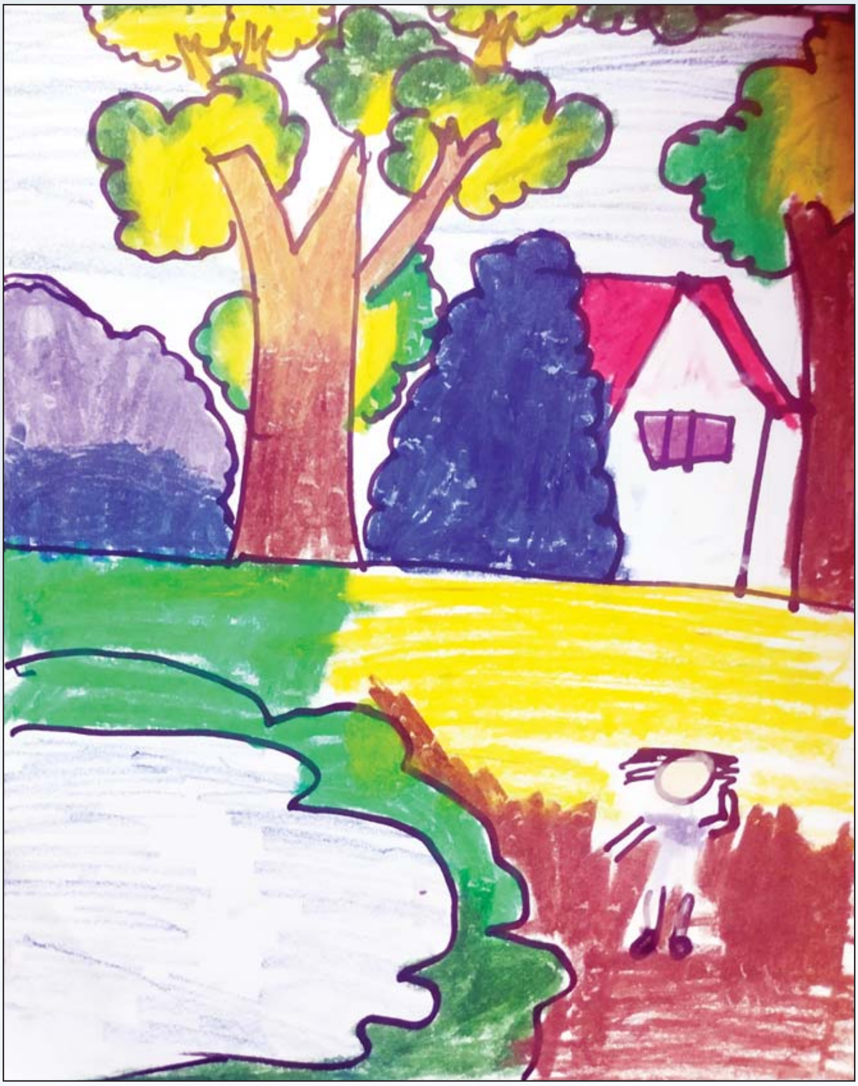

সামিকা নূর ইমি, প্রথম শ্রেণি, চারুপাঠ হাতেখড়ি স্কুল, মিরপুর, ঢাকা

গল্প

Rv`i †cbwmj

আজহার মাহমুদ

শিহাব খুবই সাধারণ একটা ছেলে। ক্লাস সিক্সে পড়ে সে। কিন্তু তার মধ্যে এক অদ্ভুত কৌতূহল- সে সবসময় নতুন কিছু বানানোর চেষ্টা করে। একদিন তার জন্মদিনে দাদু তাকে একটা পুরনো পেনসিল উপহার দিলেন। পেনসিলটা দেখতে সাধারণ হলেও দাদু রহস্যময় কণ্ঠে বললেন, 'এটা কিন্তু জাদুর পেনসিল! যা আঁকবে, তাই বাস্তবে পরিণত হবে!'

শিহাব প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি, তবে সে পরীক্ষা করে দেখতে চাইল। সে কাগজে একটা আপেল আঁকল। হঠাৎ করে আঁকা আপেলটা কাগজ থেকে বাস্তবে লাফিয়ে উঠল! সে অবাক হয়ে গেল! এরপর সে একটা ছোট্ট খেলনা গাড়ি আঁকল, আর সাথে সাথে সেটাও বাস্তবে রূপ নিলো!

শিহাব আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। সে ভাবল, ‘এই পেনসিল দিয়ে আমি অনেক কিছু তৈরি করতে পারব!’ সে নিজের জন্য চকলেট, খেলনা, বই-সবকিছু আঁকতে লাগল। কিন্তু ধীরে ধীরে সে বুঝতে পারলো, পেনসিলের শক্তি সীমাহীন নয়।

একদিন তার ছোটো বোন তামান্না কাঁদছিলো কারণ তার প্রিয় খেলনা টেডি বিয়ার হারিয়ে গিয়েছিল। শিহাব তার জাদুর পেনসিল দিয়ে ঠিক তামান্নার খেলনাটির মতো একটি টেডি বিয়ার এঁকে দিলো। তামান্না খুশিতে লাফিয়ে উঠল! শিহাব তখন বুঝতে পারল, সত্যিকারের আনন্দ শুধু নিজের জন্য কিছু বানিয়ে পাওয়া যায় না বরং অন্যদের সাহায্য করাতেও অনেক সুখ লুকিয়ে আছে।

এরপর থেকে শিহাব শুধু নিজের জন্য কিছু আঁকা বন্ধ করল। সে তার পেনসিল দিয়ে গরিব শিশুদের জন্য জামাকাপড়, ক্ষুধার্ত পাখিদের জন্য খাবার আর তার আশেপাশের লোকদের সাহায্য করার জন্য দরকারি জিনিসপত্র আঁকতে লাগল।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সে দেখল, তার জাদুর পেনসিলটি আর নেই! সে খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে একটা ছোট্ট নোট পেলো, যেখানে লেখা ছিল, তুমি তোমার দায়িত্ব সফলভাবে পালন করেছ শিহাব! প্রকৃত জাদু হলো ভালোবাসা ও সাহায্য করার ইচ্ছা।

শিহাব বুঝতে পারল জাদুর পেনসিলের শক্তি শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু সে যা শিখেছে, সেটাই আসল জাদু। এরপর থেকে সে নিজের প্রতিভা দিয়ে নতুন নতুন জিনিস বানানোর চেষ্টা করতে লাগল, আর সবার জন্য ভালো কিছু করার শপথ নিল।

এভাবেই শিহাব হয়ে উঠল সত্যিকারের এক মানুষ! ❑

রিপোর্টার, চট্টগ্রাম সময় পত্রিকা

সায়েন্স ফিকশন

কম্পিরাস

আশরাফ পিন্টু

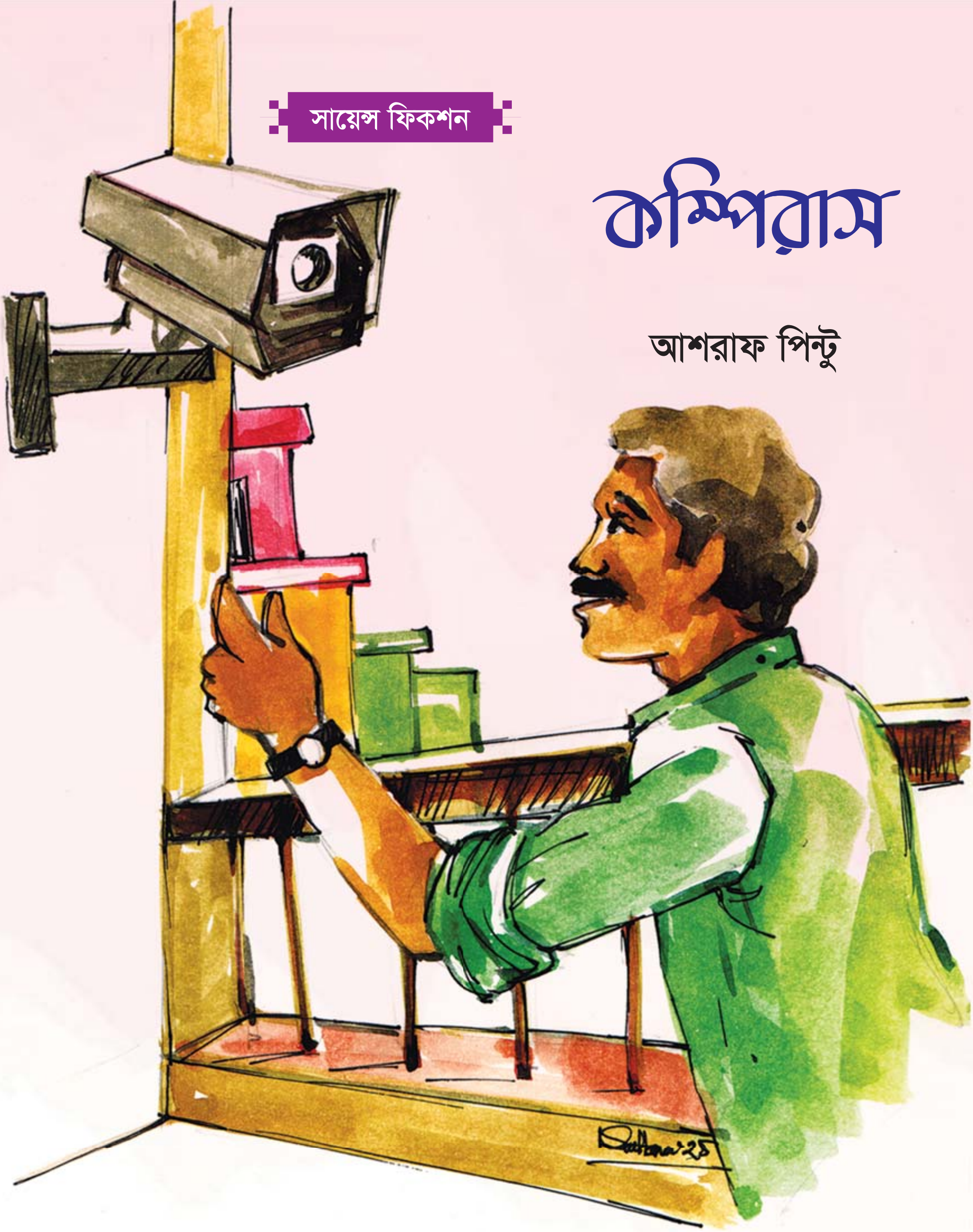

আশরাফ সাহেব বিষণ্ন মনে বিছানায় শুয়ে আছেন। কিছুই ভালো লাগছে না তার। শখের ল্যাপটপটি চুরি হয়ে গেছে। ল্যাপটপটির দাম প্রায় এক লাখ টাকা। কিন্তু টাকাটা বড়ো কথা নয়; ওর মধ্যে তার লেখক জীবনের যাবতীয় তথ্য ছিল। প্রকাশিত- অপ্রকাশিত প্রায় অর্ধশত বইয়ের পাণ্ডুলিপি ছিল ওখানে। ল্যাপটপের ডকুমেন্টগুলো দুটি পেনড্রাইভেও সংরক্ষিত ছিল; চোর পেনড্রাইভ দুটিও চুরি করে নিয়ে গেছে। লেখক জীবনের সবকিছু হারিয়ে তিনি যেন পঙ্গু হয়ে গেছেন।

এমন মনমরা হয়ে শুয়ে থাকলে কাজ হবে? পারলে চোর ধরো। হঠাৎ আশরাফ সাহেবের স্ত্রী রূপালি বেগম রুমে ঢুকে পড়ে।

–কীভাবে ধরব?

–একটু ঘোরাফেরা করো; অনেক সময় চোরেরা পুরাতন কম্পিউটারের দোকানে এসব বিক্রি করে। একটু চেষ্টা করেই দেখো না।

–যা গেছে, তা কি আর পাওয়া যাবে? চোরেরা আমাদের চেয়ে অনেক চালাক, তারা আশেপাশের কোনো দোকানে এগুলো বিক্রি করবে না। কিছুক্ষণ থেমে আশরাফ সাহেব বিষণ্ন মনে বলেন, আমি ল্যাপটপের কথা ভাবছি না, ভাবছি আমার লেখালেখির ডকুমেন্টের কথা।

–ওগুলো কি আর ফিরে পাওয়া যাবে?

–যদি পেনড্রাইভ দুটির একটি ফিরে পেতাম!

–সেই আশায় বসে থাকো। দেখো আকাশ থেকে হয়ত টুপ করে পড়তেও পারে। রূপালি বেগম এবার স্বর একটু নরম করে বলে, ওসব অবাস্তব চিন্তা বাদ দিয়ে তার চেয়ে এক কাজ করো...

–কী কাজ?

–বাড়িতে সিসি ক্যামেরা বসাও।

–এতে কি ল্যাপটপ ফিরে পাওয়া যাবে?

–কী মুশকিল! ল্যাপটপ হারিয়ে কি তোমার বুদ্ধি নাশ হয়েছে? তুমি লেখক মানুষ। ল্যাপটপ ছাড়া তোমার চলবে না। আরেকটা ল্যাপটপ কেনো এবং সেটি যাতে চুরি না হয় এজন্য রুমের সামনে বারান্দায় সিসি ক্যামেরা বসাও।

–ঠিক বলেছ। আশরাফ সাহেব বিছানা থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়েন। মনে মনে বলেন, দু-দিন ধরে কত আজেবাজে চিন্তা করেছি অথচ এমন সুন্দর চিন্তা মাথায় আসেনি।

আশরাফ সাহেব দোকান থেকে নিউ জেনারেশনের একটি ল্যাপটপ নিয়ে আসেন। ফ্রি স্বরূপ রুমের সামনে বারান্দায় একটি সিসি ক্যামেরা বসিয়ে দিয়ে যায় ওরা। সিসি ক্যামেরাটিও অত্যাধুনিক, সেটাও ল্যাপটপ ও মোবাইলের সংযোগে চলে।

ল্যাপটপটি নতুন ও আধুনিক হলেও কাজে মন বসে না আশরাফ সাহেবের। শুধুই আগের ল্যাপটপটির কথা মনে পড়ে। কত পাণ্ডুলিপি ছিল ওই ল্যাপটপটিতে- গল্প, প্রবন্ধ, ছড়া, কবিতা; আরো কত কী! একবার যদি ফিরে পাওয়া যেত ওই সব ডকুমেন্টস। অতি দুঃখের মধ্যেও হাসি পায় আশরাফ সাহেবের। কি সব অবাস্তব চিন্তা করছে সে। এমন সময় সাইরেন বেজে ওঠে।

আশরাফ সাহেব দরজা খুলে দেখে সদ্য লাগানো সিসি ক্যামেরার সাইরেন। গ্রিল দিয়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখে ভিতরে কেউ ঢুকছে কি না। নাহ কেউ নেই।

আশরাফ সাহেব দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকবেন এমন সময় বাইরে থেকে কথা শোনা যায়- চিন্তা করো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

কণ্ঠস্বরটি পরিচিত মনে হয় আশরাফ সাহেবের কাছে। তার ছেলে স্বননের কণ্ঠস্বরের মতো মনে হচ্ছে। সিসি ক্যামেরাটি লাগানোর পর তার ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থেকে কথা বলেছে। ক্যামেরাটি মুভ হয়ে উলটো দিকে ছিল। এ কথা জানাতেই স্বনন তা ঠিক করে দিয়েছে। সাইরেনটি অটো বাজছিল না। ও বলল, সব ঠিক হয়ে যাবে। স্বনন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্র। ও এসব বিষয়ে খুবই পারদর্শী।

আশরাফ সাহেব দরজা খুলে আবার বারান্দায় বের হন। বলেন, স্বনন, সব ঠিক হয়ে গেছে ?

ক্যামেরা থেকে শব্দ আসে, আমি স্বনন নই, কম্পিরাস। অনেকে আমাকে কম্পিউটার ভাইরাস বলে, আসলে আমি স্পাই-ভাইরাস, নাম কম্পিরাস। সিসি ক্যামেরা, কম্পিউটার, ই-মেইল সব ধরনের ইলেকট্রো মিডিয়ায় আমি চলাচল করতে পারি।

কম্পিরাসের কথা শুনে আশরাফ সাহেব অবাক হয়ে যান। একটি আণুবীক্ষণিক জীব সে কি না তার সঙ্গে কথা বলছে! ভাইরাস আছে এটা পরীক্ষিত সত্য কিন্তু সে যে কথা বলে এটা তার জানা ছিল না। আশরাফ সাহেব নিজেকে স্বাভাবিক করে নিয়ে বলেন, বুঝলাম কিন্তু আমাকে কি কিছু বলবে তুমি?

–হ্যাঁ।

–বলো।

–আপনি খুব দুঃখে ভারাক্রান্ত আছেন। কারণ আপনার লেখক জীবনের প্রায় সব ডকুমেন্ট চুরি হয়ে গেছে।

–হ্যাঁ, খুবই খারাপ লাগছে। দু-দিন কিছু খেতে পারিনি।

–এগুলো তো চোরের কাছে থেকে ফেরত পাওয়া যাবে না।

–না।

–যদি এগুলো আমি আপনাকে এনে দেই।

–কী বলছো! আশরাফ সাহেবের চোখ বিস্ফোরিত হয়ে যায়।

–ডকুমেন্টস ফিরিয়ে আনা আমার জন্য কোনো সমস্যাই নয়।

–এটা অসম্ভব মনে হচ্ছে আমার কাছে।

এই বিজ্ঞানের যুগে অসম্ভব বলে কিছু নেই। এতদিন কম্পিউটার ভাইরাসকে আপনারা শুধু খারাপই মনে করেছেন। এদের মধ্যে কিছু ভালো এবং অত্যাধুনিক ক্ষমতাসম্পন্ন ভাইরাসও আছে- তার মধ্যে আমি একজন।

–প্রমাণ না দিলে তোমার কথা কীভাবে বিশ্বাস করব?

–আধঘণ্টা পর আপনি আপনার ল্যাপটপটি খুললেই বুঝতে পারবেন।

ক্যামেরা থেকে আর কোনো কথা শোনা যায় না। আশরাফ সাহেব সম্মোহিতের মতো কিছুক্ষণ সিসি ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। এরপর রুমে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়েন। আধঘণ্টা বিশ্রাম নেবার পর ধীরে ধীরে ল্যাপটপের সামনে গিয়ে বসেন। আলতো করে ল্যাপটপের নবে চাপ দেন। ল্যাপটপটি চালু হতে থাকে। এরপর সফটওয়্যারে মাউস ক্লিক করতেই বিস্মিত হয়ে যান আশরাফ সাহেব। সত্যি সত্যি তার ডকুমেন্টস ফিরে এসেছে! ❑

স্বপ্নভরা দিন

তানভির আহমেদ

ভোরের আলো জেগে হয়
অনুভবের সৃষ্টি
রঙিন স্বপ্ন চোখে ভাসে
আনন্দে ভরা দৃষ্টি।

পাঠশালায় যায় তারা
খুশিতে ভরা বুক,
শিক্ষার আলো জ্বলে ওঠে
করে দূর সব দুঃখ।

ভালোবেসে শেখে তারা
মায়া-মমতার গান,
ভবিষ্যতের আলো তারা
দেশের গর্বের প্রাণ।

ফুলের মতো কোমল তারা
শিশিরে ধোয়া মন,
পড়ালেখা আর খেলাধুলায়
মেতে থাকুক সারাক্ষণ।

অর্নাস ১ম বর্ষ, হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ, ঢাকা

শমসের গাজীর সুড়ঙ্গ

তৌহিদুল আলম

শমসের গাজীর সুড়ঙ্গ দেশের তালিকাভুক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। ছাগলনাইয়া উপজেলা সদর থেকে পুরোনো ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ধরে ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে গেলেই চম্পকনগর। সেখানে থেকে অটোরিকশায় এক কিলোমিটার পাড়ি দিলেই জগন্নাথ সোনাপুর গ্রাম। পাখির কলতানে মুখর সবুজ-শ্যামল গ্রামের বড়ো এক দিঘির পাড়ে ছোটো একটা টিবি। তার গায়ে মাটি কেটে বানানো একটা সুড়ঙ্গের মুখ। উঁকি দিলে অপর প্রান্ত দেখা যায় না। জাগে কৌতূহল নিরিবিলি পাড়াগাঁয়ে এমন সুড়ঙ্গ কে তৈরি করেছে, এটা ভেবে বিস্মিত হবেন নতুন কেউ। এলাকার লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলে বলেন, শমসের গাজীর সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গপথ পানে তাকালেই রহস্যময় এক অনুভূতির সৃষ্টি হয় সবার মাঝে। কালের আখ্যান হয়ে থাকা অবিভক্ত বাংলায় তৈরি হওয়া এ সুড়ঙ্গের এখন এক মুখ বাংলাদেশে অন্য মুখ ভারতে। সুড়ঙ্গ ও শমশের গাজীর ভিটা নিয়ে রয়েছে অনেক উপাখ্যান।

ভাটির বাঘ নামে পরিচিত শমসের গাজী একসময় এ এলাকা শাসন করতেন। এখানে তিনি তৈরি করেছিলেন সুবিশাল কেল্লা, সুড়ঙ্গ আর দিঘি। কেন এই সুড়ঙ্গ নির্মাণ করা হয়েছে, জানতে চাইলে গ্রামের বাসিন্দাদের কেউ বলেন, আক্রমণকারী শত্রুপক্ষের যোদ্ধাদের ঠেকাতে। আবার কেউ বলেন, বাড়ির নারীদের গোসলের জন্য পুকুরে যাওয়ার পথ ছিল এটি। সুড়ঙ্গটি নির্মাণের সময় এর দৈর্ঘ্য ৪০-৪৫ মিটার ছিল বলে দাবি করেন অনেকে। সে সময় এটির একটি মুখ ছিল চম্পকনগর গ্রামে, অন্য প্রান্তে ছিল ভারতের

ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলার আমলি ঘাটে। তবে মাঝখানের অনেক স্থান ধসে যাওয়ায় এখন আর ভারতের সঙ্গে সুড়ঙ্গটির সংযোগ নেই।

শমসের গাজী বর্তমান ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলাতে জন্মগ্রহণ করেন । তার পিতার নাম পীর মুহাম্মদ মতান্তরে পেয়ার মুহাম্মদ খান এবং মাতার নাম কৈয়্যারা বিবি।

শৈশবে বাবা মারা গেলে শুভপুরের তালুকদার জগন্নাথ সেনের বাড়িতে পুত্রস্নেহে বড়ো হন তিনি। সেখানেই তির-ধনুক, তলোয়ার চালানোসহ সমরবিদ্যায় পারদর্শী হন। এরপর দিকে দিকে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে শমসের গাজীর।

সে সময় তিনি চোর, ডাকাত ও জলদস্যুদের রুখতে এক শক্তিশালী বাহিনী গড়ে তোলেন। কৃষক-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অর্জন করেন জমিদারি। তারপর নিজের জ্ঞান, শক্তি, দক্ষতা ও পরিশ্রম দিয়ে তিনিও একসময় হয়ে ওঠেন জমিদার। টানা এক যুগ ত্রিপুরা রাজ্য শাসন করেন এই বীর। ভাটির বাঘ বলে পরিচিতি লাভ করেন। বহু যুদ্ধক্ষেত্র দাঁপিয়ে বেড়িয়েছেন বীর শমসের। শত্রু সেনা বিনাশ করতে কখনো পিছপা হননি। তার কাছে কোণঠাসা হয়ে পড়ে ইংরেজ বেনিয়ারা। ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির আগ্রাসন প্রতিহত করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন তিনি। শমসের গাজী নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পর তিনিই ঔপনিবেশিক শক্তির হাতে প্রথম নিহত হন। তবে ভাটির বাঘ পরিচয়ে তিনি আজও বেঁচে আছেন কৃষকের মনে।

সুড়ঙ্গের অদূরেই রয়েছে শমসের গাজীর একটি দিঘি। যাকে এক খুইল্লাও বলা হয়। এ দিঘিটিকে নিয়েও রয়েছে নানা গল্প। দেখতে ছোটো হলেও এ দিঘিটি এখনও কেউ ঢিল ছুড়ে পার করতে পারেননি। স্থানীয় প্রবীণরা বলেন, এতে অলৌকিক শক্তি আছে যে শক্তির কারণে ঢিল ছুড়ে পার করা যায় না।

শমসের গাজী

সর্বকনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক মাস্টার মনন

গত জুলাইয়ে মাত্র ১৪ বছর বয়সে হয়েছিল জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। তবে এটুকুতেই থামতে চায়নি মনন রেজা, স্বপ্ন ছিল আরও বড়ো কিছু অর্জনের। সেই স্বপ্ন পূরণের পথে এবার ফিদে মাস্টার থেকে আন্তর্জাতিক মাস্টার হয়েছেন বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জের কিশোর জাতীয় দাবা চ্যাম্পিয়ন মনন রেজা নীড়। শুক্রবার ৪ঠা অক্টোবর ২০২৪ হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে গ্র্যান্ডমাস্টারস দাবা টুর্নামেন্টে অষ্টম রাউন্ডে ভারতের আন্তর্জাতিক মাস্টার পান্ডা সাম্বিতকে হারিয়েছেন নীড়। এতে আট রাউন্ডে ছয় পয়েন্ট হওয়ায় একটি আন্তর্জাতিক মাস্টার নর্ম পেয়েছেন তিনি।

আন্তর্জাতিক মাস্টার হতে ২৪০০ রেটিং ও তিনটি নর্ম প্রয়োজন। নীড়ের রেটিং ইতোমধ্যে ২৪৫০। দুটি নর্ম আগেই ছিল নীড়ের। শুক্রবার তৃতীয় নর্ম পাওয়ায় আন্তর্জাতিক মাস্টার হওয়ার সকল শর্ত পূরণ করেছেন তিনি। এই জয় তার কাছে হয়ে এসেছে লক্ষ্য পূরণে বড়ো একটা বাঁক হিসেবে।

বুদাপেস্টে গ্র্যান্ডমাস্টার টুর্নামেন্টে নীড় নিজেকে শুধু ছাপিয়ে যাননি আন্তর্জাতিক মাস্টার হওয়ার পথে মনন ভেঙেছে গ্র্যান্ডমাস্টার নিয়াজ মোরশেদের রেকর্ড। নিয়াজকে ছাড়িয়ে মননই এখন সর্বকনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক মাস্টার। গ্র্যান্ডমাস্টার নিয়াজ মোর্শেদের পর ১৫ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক মাস্টার হওয়ার খেতাব অর্জন করেছেন তিনি। ১৯৬৬ সালের ১৩ই মে জন্ম নিয়াজের। শারজাহতে এশিয়ান জোনাল খেলে নিয়াজ আন্তর্জাতিক মাস্টার হন ১৯৮১ সালের ১৩ই অক্টোবর। তার মানে ১৫ বছর ৫ মাসে তিনি আইএম হন। ফিদের সার্টিফিকেট পান ১৯৮২ সালে। মননের জন্ম ২০১০ সালের ১৮ই জুন। এখন তার বয়স ১৪ বছর ৩ মাস। সে হিসেবে মননই দেশের সবচেয়ে কম বয়সি আন্তর্জাতিক মাস্টার। নীড়ের আগে জিল্লুর রহমান চম্পক, আবু সুফিয়ান শাকিল, মিনহাজ উদ্দিন সাগর ও ফাহাদ রহমান এই টাইটেল পেয়েছেন। এদের মধ্যে শুধু ফাহাদ গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার দৌড়ে ভালোভাবে আছেন।

বুদাপেস্টে ৪৫তম দাবা অলিম্পিয়াড শেষে বাংলাদেশের পাঁচ দাবাড়ু নিজ খরচে তিনটি টুর্নামেন্ট খেলছেন সেখানেই। যার মধ্যে প্রথম টুর্নামেন্টে ওয়াদিফা আহমেদ নিজের প্রথম মহিলা আন্তর্জাতিক মাস্টার নর্ম পেয়েছেন। দ্বিতীয় টুর্নামেন্টে আন্তর্জাতিক মাস্টার হওয়ার লক্ষ্য পূরণ হলো মনন রেজার।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

আঠারো বছরে ১৪ পর্বত জয়

আজীবন পর্বতারোহীরা যে স্বপ্নের পেছনে ছুটে বেড়ান, নেপালের নিমা রিনজি শেরপা মাত্র ১৮ বছর বয়সে সেই স্বপ্ন ছুঁয়ে ফেলেছেন। সম্প্রতি তিনি তিব্বতের ৮ হাজার ২৭ মিটার উঁচু শিশা পাংমা পর্বতের চূড়ায় পৌঁছান। এর মধ্য দিয়ে এই তরুণ সবচেয়ে কম বয়সে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি উচ্চতার ১৪টি পর্বতের সবকটি জয় করলেন।

এই পর্বতগুলোর প্রত্যকটির উচ্চতা ৮ হাজার মিটারের বেশি। তাই এগুলোকে একসঙ্গে 'আট হাজারি' পর্বতশৃঙ্গ বলা হয়।

আট হাজারের বেশি উচ্চতার এসব পর্বত জয় করতে হলে পর্বতারোহীদের 'ডেড জোন' বা ভয়ংকর এলাকা পার হতে হয়। ডেড জোনের বাতাসে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন থাকে না। শিশা পাংমা পর্বত জয়ের পর এক বিবৃতিতে নিমা বলেন, 'এই জয় শুধু আমার ব্যক্তিগত লক্ষ্যের চূড়ায় পৌঁছানো নয়, বরং এই জয় ওই সব শেরপার জন্য, যাঁরা বহুদিন ধরে প্রথার নামে চাপিয়ে দেওয়া সীমাবদ্ধতাকে পেছনে ফেলে স্বপ্নের পেছনে ছোটার সাহস দেখিয়েছেন। পর্বতারোহণ শুধু শ্রমসাধ্য নয়, বরং এর থেকে বেশি কিছু। এটা আমাদের দৃঢ়তা, সহনশীলতা ও আবেগের বহিঃপ্রকাশ।'

এর আগে ২০১৯ সালে ৩০ বছর বয়সী মিংমা গিয়াবু 'ডেভিড নামে আরেক নেপালী এই রেকর্ড গড়েছিলেন।নিমা এবার সেই তরুণের রেকর্ড ভেঙেছেন।

বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ১৪টি পর্বতশৃঙ্গ হিমালয় ও কারাকোরাম পর্বতমালায় অবস্থিত, যা নেপাল, চীন, ভারত ও পাকিস্তানে বিস্তৃত। বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ জয়ের এমন অভিযান পর্বতারোহীদের জন্য বিশাল মর্যাদার।

নিমা আগেও একাধিক রেকর্ড গড়েছেন। ১৬ বছর বয়সে তিনি বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতগুলোয় আরোহণ শুরু করেন। ২০২২ সালের আগস্টে তিনি মাউন্ট মানাসলু (৮ হাজার ১৬৩ মিটার) জয় করে নিজের লক্ষ্যের পেছনে যাত্রা শুরু করেন। এরপর তিনি একে একে জয় করেন এভারেস্ট, লোৎসে, নাগা পর্বত, গাশারব্রুম ১, গাশারব্রুম ২, ব্রড পিক, কে টু, ধৌলাগিরি, চো ওয়ু, অন্নপূর্ণা, মাকালু।

চলতি বছরের জুনে নিমা কাঞ্চনজঙ্ঘা জয় করে নিজের লক্ষ্যের খুব কাছে পৌঁছে যান। শিশাপাংমা জয় করে স্বপ্নের চূড়ায় পৌঁছান তিনি। নেপাল মাউন্টেনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নিমা নুরু শেরপা বলেছেন, 'নিমার এ জয় দেশের জন্য দারুণ গর্বের। সে সব প্রথা ভেঙে এগিয়ে গেছে। নিজের লক্ষ্যে অবিচল থাকলে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। নিমার সাফল্য এই বার্তাই দিয়েছে।'

প্রতিবেদন : জহিরুল ইসলাম

শিশুর জলবসন্ত

চিকেনপক্স বা জলবসন্ত একটি অতি পরিচিত ও ছোঁয়াচে রোগ। এটি সাধারণত ভ্যারিসেলা জস্টার নামক ভাইরাস থেকে হয়ে থাকে। যে-কোনো বয়সের লোক এই জীবাণুতে আক্রান্ত হতে পারে । তবে রোগটি ঝুঁকিপূর্ণ নয়। তবে এই ভ্যারিসেলা জস্টার জীবাণুটি রোগীর দেহে সুপ্ত অবস্থায় থেকে যায় এবং পুনরায় সক্রিয় হয়ে হারপিস জাস্টার রোগের সৃষ্টি করে।

যেভাবে ছড়ায় : আক্রান্ত শিশুর সরাসরি সংস্পর্শে এলে, আক্রান্ত শিশুর থুথু, হাঁচি ও কাশির মাধ্যমে, আক্রান্ত শিশুর ব্যবহৃত সামগ্রীর মাধ্যমে, গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাসের মধ্যে মা আক্রান্ত হলে গর্ভজাত শিশুও আক্রান্ত হতে পারে, শিশু প্রসব হওয়ার এক সপ্তাহ আগে ও পরের সময় মা আক্রান্ত হলে নবজাতকের চিকেনপক্স হতে পারে।

সময়কাল : গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে ঠান্ডার সময় এ রোগ বেশি দেখা দেয়। তবে মহামারীর আকারে বছরজুড়েই এর বিস্তার দেখা যেতে পারে।

বিস্তারকাল : র‍্যাশ অথবা দানা ওঠার দু'দিন আগে থেকে শুরু করে দানাগুলো শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত।

লক্ষণসমূহ : সাধারণত ২-৮ বছরের শিশুদের বেশি হতে দেখা যায়। রোগটির সুপ্তকাল অতিক্রম করে প্রথম দিকে জ্বর, যা ১০০- ১০৫ ফা. পর্যন্ত ওঠে, ক্লান্ত লাগা, মাথাব্যথা, অরুচি, বমিভাব হতে দেখা যায়। তবে এক বছর বয়সের নিচের শিশুদের প্রাথমিক এই লক্ষণগুলো সাধারণত দেখা যায় না। এ ক্ষেত্রে সরাসরি প্রথম দিনেই র‍্যাশ অথবা লালচে দাগ চামড়ায় দেখা যেতে পারে। দানাগুলো প্রথম দিকে লালচেভাব পরে উঁচু হয়ে পানিপূর্ণ হয়ে ৩/৪ দিন থাকার পর ঘোলাটে হয়ে যায়। শেষে দানাগুলো শুকিয়ে গিয়ে আলগা আবরণটি খসে পড়তে দেখা যায়। চামড়ার এই সংক্রমণ মাথা ও মুখমণ্ডল থেকে শুরু করে শরীরের বিভিন্ন স্থান যেমন বুক, পেট, হাত, পা পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। একদিকে প্রথম দিকের দানাগুলো শুকাতে শুরু করলেও নতুন নতুন দানা শরীরের বিভিন্ন স্থানে উঠতে দেখা যায়। দানাগুলোয় প্রচণ্ড চুলকানি অনুভূত হয়। একই রকম পানিপূর্ণ দানা শরীরের ভেতরের বিভিন্ন স্থানে যেমন- মুখগহ্বর, জিহ্বা এবং চোখে দেখা যেতে পারে। চিকেনপক্সের টিকা দেওয়া থাকলে রোগাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমে যায়। তবে ওয়াইল্ড টাইপের ভাইরাসের মাধ্যমে আক্রান্ত হলে টিকা দেওয়া থাকলেও রোগাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে সে ক্ষেত্রে রোগটির তীব্রতা কম হয়ে থাকে।

প্রতিরোধ : চিকেনপক্স যেহেতু ছোঁয়াচে রোগ, তাই আক্রান্ত শিশুদের অন্য শিশুদের কাছ থেকে আলাদাভাবে রাখতে হবে। র‍্যাশগুলো চোখে পড়ার দু'একদিন আগে থেকেই জলবসন্তের রোগজীবাণু ছড়াতে শুরু করে। চিকেনপক্সের টিকা দিয়ে এ রোগের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালীন প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলা সম্ভব। ৯ মাস বয়সের পর থেকেই এই টিকা দেওয়া যায়, যা ৬ সপ্তাহের ব্যবধানে ২টি ডোজ সম্পন্ন করতে হয়। তাই আতঙ্কিত নয়, সচেতন হলেই শিশুকে জলবসন্ত থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

হোমলেস বিশ্বকাপে বাংলাদেশ

দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হয় হোমলেস ওয়ার্ল্ড কাপ বা গৃহহীনদের বিশ্বকাপ ২০২৪। ফুটবলের এই আসরে প্রথমবার অংশ নিল 'বাংলাদেশ হোমলেস টিম'। আটটি দলের সঙ্গে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে সাতটিতে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ দল।

ভিসা জটিলতার কারণে গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হোমলেস ওয়ার্ল্ড কাপে অংশগ্রহণ করতে পারেনি বাংলাদেশ দল।

এবারও নির্ধারিত সময়ের সাড়ে ৪ ঘণ্টা পর ভিসা পাওয়ায় মূল পর্বে খেলতে পারেনি বাংলাদেশ। তবে আয়োজকরা বাংলাদেশ দলকে র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে থাকা দলগুলোর সঙ্গে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলার সুযোগ করে দেয় এবং আটটি দলের সঙ্গে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে সাতটিতে জয় পায় বাংলাদেশ দল। সব কটি ম্যাচ ফিফা তাদের লাইভ প্লাস অ্যাপে সরাসরি সম্প্রচার করে।

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়াবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী খায়রুল। বাংলাদেশ হোমলেস টিমের গোলরক্ষক। বাগেরহাটে অন্যের জমিতে ঘর তুলে থাকে তাঁর পরিবার। স্কুল-কলেজে পড়ার সময় ক্লাসে যাওয়ার আগে সকালে ও ক্লাস থেকে ফিরে বাবার সঙ্গে বর্গাজমিতে কাজ করতেন। এখনো ছুটিতে বাড়ি গেলে বাবার সঙ্গে মাঠে কাজে যান।

আরেকজন কুষ্টিয়ার সেলিম রেজা। জন্মগতভাবেই যার ডান পা ছোটো। এটা তাঁর দ্বিতীয় বিদেশযাত্রা। এই তরুণ ২০২৩ সালে চীনের বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত প্যারাঅলিম্পিকে অংশ নিয়ে হাইজাম্পে চতুর্থ হয়েছিলেন। এইচএসসি পাস সেলিম বছরে তিন-চার মাস শহরে এসে রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। বাকি সময় দৌলতপুরে বাবার সঙ্গে গ্রামে মাছ ধরেন। প্রস্তুতি হিসেবে শ্রীমঙ্গলে ক্যাম্প করে প্র্যাকটিস করেছে সে। ২২ বছর বয়সি খায়রুল ও সেলিমদের মতো সাতজন খেলতে গিয়েছিলেন হোমলেস ওয়ার্ল্ড কাপ বা গৃহহীনদের বিশ্বকাপে। তারা 'বাংলাদেশ হোমলেস টিম'-এর সদস্য। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী

ও প্রতিবন্ধীদের খেলার অধিকার নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংস্থা স্পোর্টস ফর হোপ অ্যান্ড ইনডিপেনডেনস (শি) এই দলের পৃষ্ঠপোষক। দলের সঙ্গে শি থেকেও গিয়েছিলেন চারজন।

হোমলেস ওয়ার্ল্ডকাপের এবারের আসরে অংশ নেয় বাংলাদেশসহ ৪০টি দল। নির্ধারিত সময়ে ভিসা না হওয়ায় বাংলাদেশ ও নামিবিয়া মূল পর্বে খেলতে পারেনি। তবে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, ইতালি, আয়ারল্যান্ড, হাঙ্গেরি ও নামিবিয়ার সঙ্গে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ। এর মধ্যে নামিবিয়ার সঙ্গে টাইব্রেকারে হারা ছাড়া বাকি সাতটিতেই জয়ী হয়ে বাংলাদেশ। ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনাকে হারানোর সেই সুখস্মৃতি ছিল দলের প্রত্যেকের মুখে মুখে।

দলটির অন্য সদস্যরা হলেন সজীব কর, মিতুল শেখ, প্রেন চং ম্রো, ফুংলিয়ান কাপ বম ও অ্যালবার্ট কলিন্স ত্রিপুরা। নিজেরাই কাজ করে পড়াশোনার খরচ চালান এই প্রান্তিক তরুণেরা। খেলার সময় হলে এর মধ্য থেকেই সময় বের করে নেন। হোমলেস ওয়ার্ল্ডকাপে বাংলাদেশ দলটির নেতৃত্ব দেন শির প্রতিষ্ঠাতা শারমিন ফারহানা চৌধুরী। কোচ ছিলেন জহিরুল হক। দলের ব্যবস্থাপক ছিলেন সংস্থার ক্রীড়া বিভাগের প্রধান পাপ্পু মোদক।

হোমলেস ওয়ার্ল্ডকাপ কী

হোমলেস ওয়ার্ল্ডকাপ ফাউন্ডেশন গৃহহীনদের একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে। সেই সংজ্ঞা অনুসারে, বাড়িঘরহীন বা রাস্তায় ঘুমিয়ে রাত কাটানো ব্যক্তিরাই শুধু গৃহহীন নন, কোনো ব্যক্তির আবাসনে যদি পর্যাপ্ত সুবিধা না থাকে, তাহলে তাকেও গৃহহীন ধরা হবে। কোনো ব্যক্তির আবাসন যদি তাকে নিরাপত্তা না দেয়, যদি তাকে উচ্ছেদ-আতঙ্কে বা হুমকির মধ্যে থাকতে হয়, আবাসনে যদি নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, বিদ্যুৎ, রান্না ও খাবার মজুত করার মতো সুযোগ-সুবিধা না থাকে এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থাকে, তাহলে ওই ব্যক্তির আবাসন পর্যাপ্ত নয় বলে বিবেচনা করে ওই ব্যক্তিকেও গৃহহীন ধরা হবে। বিশ্বের ৭০টি দেশে 'হোমলেস ওয়ার্ল্ডকাপ'-এর সদস্য রয়েছে। ২০২২ সালে হোমলেসওয়ার্ল্ড কাপ ফাউন্ডেশনের সদস্যপদ পায় শি।

প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা

আবু সাঈদের প্রতিকৃতি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত প্রথম শহিদ রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদ। তার দুই হাত প্রসারিত করে দাঁড়ানো ছবিটি প্রাকৃতিক ধানগাছ দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে গাজীপুরের শ্রীপুরে ফসলি মাঠে। এ শস্যচিত্রটি বানিয়েছেন কৃষক মো. এনামুল হক। তিনি গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার বেকাসাহারা গ্রামের একজন কৃষক ও ব্যবসায়ী ।

শ্রীপুর উপজেলার বেকাসাহারা গ্রামের বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতে সবুজ ও বেগুনি রঙের ধানগাছ রোপণ করে ফুটিয়ে তোলা হয় শহিদ আবু সাঈদের অবয়ব চিত্র। সড়ক থেকে বিস্তীর্ণ মাঠে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। আবু সাঈদের এমন দৃশ্য দেখে সবার হৃদয় কেঁপে ওঠে। সবুজ ধানের জমিতে দুই হাত প্রসারিত করে বুকে বুলেট পেতে নেওয়ার দৃশ্য সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে উপভোগ করেন দর্শনার্থীরা। এ ছবিটি সারাদেশে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

শহিদ আবু সাঈদের প্রতিকৃতি তৈরির বিষয়ে মো. এনামুল হক বলেন, প্রথমে সুতা দিয়ে আবু সাঈদের অবয়ব তৈরি করেন। এরপর সেই গঠন অনুযায়ী রোপণ করেন দুই জাতের ধান গাছ। তার সঙ্গে ধান রোপণে সহযোগিতা করেছেন আরও কয়েকজন। শহিদ আবু সাঈদের উৎসর্গ স্মরণীয় করতেই তিনি এবার শস্যচিত্রে তা ফুটিয়ে তুলেছেন।

এছাড়াও এনামুল প্রতি বছর ফসলি জমিতে ধান রোপণের মধ্য দিয়ে ভিন্ন ধরনের কিছু একটা করে থাকেন। ২০২১ সালে প্রথম তার এক বিঘা জমিতে বেগুনি ধান রোপণ করেন। পরের বছর মাকে ভালোবেসে এক বিঘা জমিতে বাংলায় 'মা' শব্দটি শস্যচিত্রে রূপ দেন। সেই শস্যচিত্র দেখে সবাই প্রশংসা করেন। সেই উৎসাহ থেকে পরের বছর জাতীয় পতাকার শস্যচিত্র তৈরি করেন, গত বছর মানবদেহের হৃৎপিণ্ডের প্রতিকৃতি- আর এবার তৈরি করেন শহিদ আবু সাঈদের প্রতিকৃতি। এটি দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে অনেক দর্শনার্থী আসেন। শহিদ আবু সাঈদের প্রতিকৃতির সঙ্গে নিজেদের স্মৃতি করে রাখতে ছবিও তোলেন।

এ বিষয়ে শ্রীপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জানান, কৃষক এনামুল হকের শস্যচিত্রের কথা শুনেছি। এটি সত্যিই প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কৃষি শুধু খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যম নয়, সৃজনশীলতারও একটি ক্ষেত্র।

প্রতিবেদন : সানজিদ হোসেন শুভ

শিশুর আচরণের নানা রহস্য

মেজবাউল হক

শিশুদেরকে নিয়ে রয়েছে অনেক রহস্য। তাদের কোনো বিষয়ে অনুমান করা সহজ নয়। শিশুদের নানা রকম আচরণের কারণ নিয়ে গবেষকরা অনেকদিন ধরে অনুসন্ধান করছেন। শিশুদের বোধশক্তির বিষয়ে বিচিত্র মজার কিছু গবেষণার তথ্য নবারুণের বন্ধুদের জন্য তুলে ধরা হলো–

ভেজা ডায়াপারে ঘুম ভাঙে না: শিশুদের পরনে প্যান্ট বা ডায়াপার ভিজে গেলে তাদের ঘুম ভাঙে কি না তা নিয়ে একটি গবেষণা হয় ২০০৭ সালে। গভীর ঘুমে থাকা ৩৪টি শিশুর ডায়াপারে হালকা গরম পানি ঢেলে তাদের হৃৎপিণ্ড, শ্বাস-প্রশ্বাস ও মাথার নড়াচড়া পর্যবেক্ষণে গবেষকেরা কোনো প্রতিক্রিয়া দেখতে পায়নি। ফলে তারা একমত ভেজা ডায়াপারে নয়, অন্য কারণে শিশুরা আচমকা জেগে ওঠে। তাই রাতে শিশুর ঘুম ভাঙলে ডায়াপার পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।

বিস্ময়কর শ্রবণশক্তি : শিশুর শ্রবণশক্তি সবার থেকে বেশি। গবেষকদের মতে, শিশুদের এই ক্ষমতা বিস্ময়কর। ২০০১ সালে এক পরীক্ষায় প্রমাণ মিলেছে। ৭–৯ বয়সি ৭৩টি শিশুকে টেলিফোনের ডায়াল বা টিভির শব্দের মতো হালকা শব্দ শোনানো হয়। পরে সেই শব্দের সঙ্গে কম্পিউটার নির্ভর আরও কয়েকটি শব্দ করা হয়। এতে গবেষকরা জানান, শিশুরা ওই হালকা শব্দ শুনতে পায় এছাড়া পরের কয়েকটি শব্দের মধ্যে থেকে টের পায়।

টক-মিষ্টি স্বাদে প্রতিক্রিয়া : শিশুর টক থেকে মিষ্টি বেশি পছন্দ। তারা এসব স্বাদের পার্থক্যও বোঝে। ১৯৮০ সালে গবেষক জ্যাকব স্টেইনার নবজাতকদের মিষ্টি ও টকের স্বাদের অনুভূতি নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি কয়েকটি শিশুর মুখে প্রথমে স্বাভাবিক স্বাদের, পরে মিষ্টি ও টক পানি দিয়ে পরীক্ষা করেন, এতে শিশুরা স্বাভাবিক পানিতে তেমন প্রতিক্রিয়া দেখায় না। কিন্তু মিষ্টি পানি জিব দিয়ে ঠোঁট মুছে নেয়। আর টক স্বাদে মুখ কুঁচকে ফেলে।

খাবারের সুবাসে আকর্ষণ: খাবারের সুবাসে তারা বয়স ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখায়। ১০ মাসের শিশুরা যেখানে হালকা স্পর্শে খুশি হয়, সেখানে ৩-৬ মাস বয়সি শিশুরা বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখায়। জাপানের একদল গবেষক ৩, ৬ ও ১০ মাস বয়সি শিশুর ওপর পরীক্ষায় দেখতে পায়, মখমল (ভেলভেট) কাপড়ের সংস্পর্শে নানা বয়সিরা ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখায়।

ভাসমান রেস্তোরাঁ

আফ্রিকার দেশ তানজানিয়া। যেখানে এমন একটি রেস্তোরাঁ রয়েছে যেটি কখনো ডাঙায় আবার কখনো সাগরের মাঝখানে থাকে। ছোটোখাটো একটা দ্বীপ নিয়ে তৈরি এই রেস্টুরেন্ট 'ভাসমান রেস্তোরা' নামেও পরিচিত। মজার ব্যাপার হচ্ছে এটি কখনোই এক জায়গায় স্থির থাকে না। দেশ-বিদেশের নামিদামি অনেক রেস্তোরাঁয় হয়ত গিয়েছেন। তবে আফ্রিকার দেশ তানজানিয়ার 'দ্য রক' রেস্তোরাঁ পৃথিবীর সব রেস্তোরাঁ থেকে একেবারেই আলাদা। বিশেষ করে জোয়ারের সময় যে পাথরের ওপর রেস্তোরাঁটি তৈরি হয়েছে সেটি নিজেই ছোট্ট এক দ্বীপে পরিণত হয়। তখন মনে হয় সাগরের মাঝখানে এক রেস্তোরাঁয় বসে খাওয়াদাওয়া করছেন। তানজানিয়ার জাঞ্জিরার দ্বীপপুঞ্জের এক দ্বীপ উনগুচা। এখানেই মিসাম্বি পিংউই সৈকতের অবস্থান। ভাটার সময় 'দ্যা রক' রেস্তোরাঁটি যে পাথরের উপর থাকে সেটি থাকে বালুর উপর। মানে তখন একে সৈকতের অংশই বলতে পারেন। অর্থাৎ বালুর ওপর পায়ে হেঁটে কিংবা বড়োজোর পায়ের পাতা ভিজিয়ে পৌঁছে যেতে পারবেন রেস্তোরাঁটিতে। তবে জোয়ারের সময় ওই রেস্তোরাঁয় গেলেই উপভোগ করতে পারবেন বেশি। তখন ওই পাথর একটি দ্বীপে পরিণত হয়। আর সেখানে যেতে হবে নৌকায় চেপে। ভারতের মহাসাগরের বুকে পাথরের এক রেস্তোরাঁয় বসে এখানকার বিশেষ বিশেষ সব মেনু উপভোগ করতে পারবেন। পাথরের এই রেস্তোরাঁয় পৌঁছার পর কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হবে। ভাটার সময় তিনপাশে পাবেন ভারত মহাসাগরের স্বচ্ছ জল আর জোয়ারের সময় জল থাকবে চারদিকে। ২০১০ সালে চালু হয় রেস্তোরাঁটি। এখানকার খাবার যথেষ্ট সুস্বাদু। তানজানিয়ার জাঞ্জিরার দ্বীপপুঞ্জ দেখার মতো একটি জায়গা।

কাজের চাপ কমাতে বিড়াল

অফিসের বিশেষ কর্মী বিড়াল! কী অদ্ভুত খবর, তাই না? অফিসের এই বিশেষ কর্মীরা সময় মেপে অফিসে ঢোকে না, তবে কাজের পরিবেশকে করে তোলে সম্পূর্ণ আরামদায়ক। তারা এই অফিসে নিয়মিত কাজ করে। এরা মানুষের মতো মিটিং বা প্রজেক্টে অংশ নেয় না। তাদের কাজ হলো কর্মীদের মন ভালো রাখা আর কাজের চাপ কমানো। অফিসের ডেস্কে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকা এক পোষা বিড়াল যার নরম গা ঘেঁষে কাজের চাপও যেন উধাও হয়ে যাচ্ছে কর্মীদের! এই চমৎকার দৃশ্য আমাদের কল্পনা নয়, বাস্তব। টোকিওর সাগিনামি ওয়ার্ডের Qnote Inc. অফিসে এমনই বিড়াল 'কর্মীদের' নিয়ে চলছে এক অদ্ভুত কর্মজীবন।

২০০৪ সালে এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার এক বছর পর কিউনোটের চারজন প্রতিষ্ঠাতা একদিন লাঞ্চে যান একটি সুসি রেস্টুরেন্টে। সেখানেই প্রথম এই অদ্ভুত আইডিয়ার জন্ম। রেস্টুরেন্টের একটি ছোট্ট বিড়ালছানাকে দত্তক নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হলে তারা ভাবলেন, অফিসে একটা বিড়াল থাকলে তো মজাই হবে। তখনই ঠিক হলো অফিসে একটা বিড়াল নেওয়া হবে। কর্মীরা জানান, বিড়ালরা কর্মক্ষেত্রে একটি সুন্দর ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। যখন খুব বেশি কাজের চাপ থাকে, তখন বিড়ালদের যত্ন নেওয়ার সময় না পেলেও আমরা সবাই একে অপরকে সাহায্য করি এই ভারসাম্য বজায় রাখতে। অফিসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় বিড়ালদের অবাধ চলাফেরা করার জন্য বিশেষভাবে নকশা করা হয়েছে। অফিসের বর্তমান অবস্থানে যাওয়ার পর, বিড়ালদের জন্য আরামদায়ক করিডোর তৈরি করা হয়েছে। যেখানে তারা ইচ্ছেমতো ঘোরাফেরা করতে পারে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিড়ালদের কার্যকলাপ কোম্পানির প্রতি মানুষের ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করেছে। আর এমন উদ্যোগ কেবল কিউনোটের কর্মীদের মন ভালো করছে না, বরং কোম্পানিকে আরও জনপ্রিয় করে তুলেছে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ১. শিশুদের কল্যাণ, নিরাপত্তা ও উন্নতি নিয়ে কাজ করা জাতিসংঘের একটি প্রতিষ্ঠান, ৫. কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাস যে মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, ৬. পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা প্রাণী, ৮. প্রকৃত, ১১. ঝাল জাতীয় মসলা

উপর-নিচ: ১.লালমণি, ২. ওশেনিয়া অঞ্চলে অবস্থিত একটি দ্বীপরাষ্ট্র, ৩. অন্ধকারে দীপ্তিমান পদার্থবিশেষ, ৪. বাগিচা, ৭. গৃহ, ৯. চালাকি, ১০. এক ধরনের রসালো ফল, ১২. পাখির ঠোঁট, ১৩. চুল বাঁধার জন্য রশি

১.		২.		৩.		৪.	
				৫.			
		৬.					
							৭.
				৮.		৯.	
১০.							
১১.		১২.		১৩.			
				১৪.			

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৬	*		+	২	=	
*		+		-		+
	*	৩	+		=	৭
-		*		+		-
৭	*		-	৫	=	
=		=		=		=
	+	৭	-		=	৬

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যে সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত: মসলা, লালাখাল, দানা, সুনাম, খাগড়াছড়ি, সুন্দর, ফড়িং, লাম, অন্দর, কানাকড়ি, কটকা,

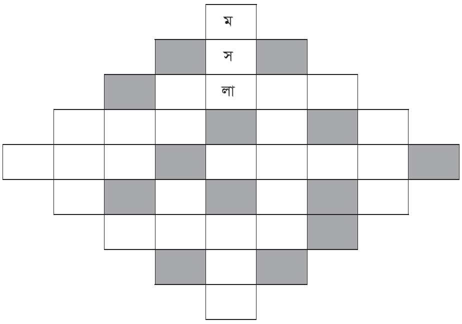

নাম্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৪৯				৩৩		৩১		২৭
	৫৩		৪৫		৩৫		২৯	
৫১		৫৫		৪৩		২৩		২৫
	৭৯		৪১		৩৭		১৯	
৮১		৫৭		৩৯		২১		১৭
	৭৭		৫৯		১৩		১৫	
৭৫		৬৯				৭		৫
	৭১		৬৭	৬২			৩	
৭৩		৬৫			১০	৯		১

সেপ্টেম্বর মাসের সমাধান

শব্দধাঁধা

		ক	ক	পি	ট		
আ	শ্বি	ন				ঝ	
মা		সা	ং	বা	দি	ক	
ন		র্ট		ই		ঝ	ড়
ত	ট			ক		কে	
			কে				নে
মৌ	রি	তা	নি	য়া			তৃ
ল			য়া	*	দূ	র	ত্ব

ছক মিলাও

				ব্য				
			ক	ব	র			
		গ		হা				
	স	র	কা	রি		তা		
		ম		ক	র	প	ল্ল	ব
	রো	জ				শ		
		ল	তি	কা		ক্তি		
				মা	ঝি			
				ন				

ব্রেইন ইকুয়েশন

৫	*	২	-	১	=	৯
+		*		*		-
৪	*	১	-	২	=	২
/		+		+		-
২	+	৩	-	৪	=	১
=		=		=		=
৭	+	৫	-	৬	=	৬

নাম্ব্রিক্স

২৩	২৪	২৭	২৮	২৯	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯
২২	২৫	২৬	৩১	৩০	৩৫	৪৪	৪৩	৪০
২১	১৮	১৭	৩২	৩৩	৩৪	৪৫	৪২	৪১
২০	১৯	১৬	৬৭	৬৬	৬৫	৪৬	৪৭	৪৮
১৩	১৪	১৫	৬৮	৬৯	৬৪	৬৩	৫০	৪৯
১২	৯	৮	৭১	৭০	৮১	৬২	৫১	৫২
১১	১০	৭	৭২	৭৯	৮০	৬১	৬০	৫৩
২	১	৬	৭৩	৭৮	৭৭	৫৮	৫৯	৫৪
৩	৪	৫	৭৪	৭৫	৭৬	৫৭	৫৬	৫৫

নুরুন নাহার মীম, পঞ্চম শ্রেণি, মনিপুর উচ্চবিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা

রাফিন আল রাজী, তৃতীয় শ্রেণি, ইংলিশ ভার্সন, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

দীপায়ন অধিকারী, চতুর্থ শ্রেণি, বিএএফ শাহীন কালেজ, ঢাকা

তাহমিদ আজমাঈন আহনাফ, তৃতীয় শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

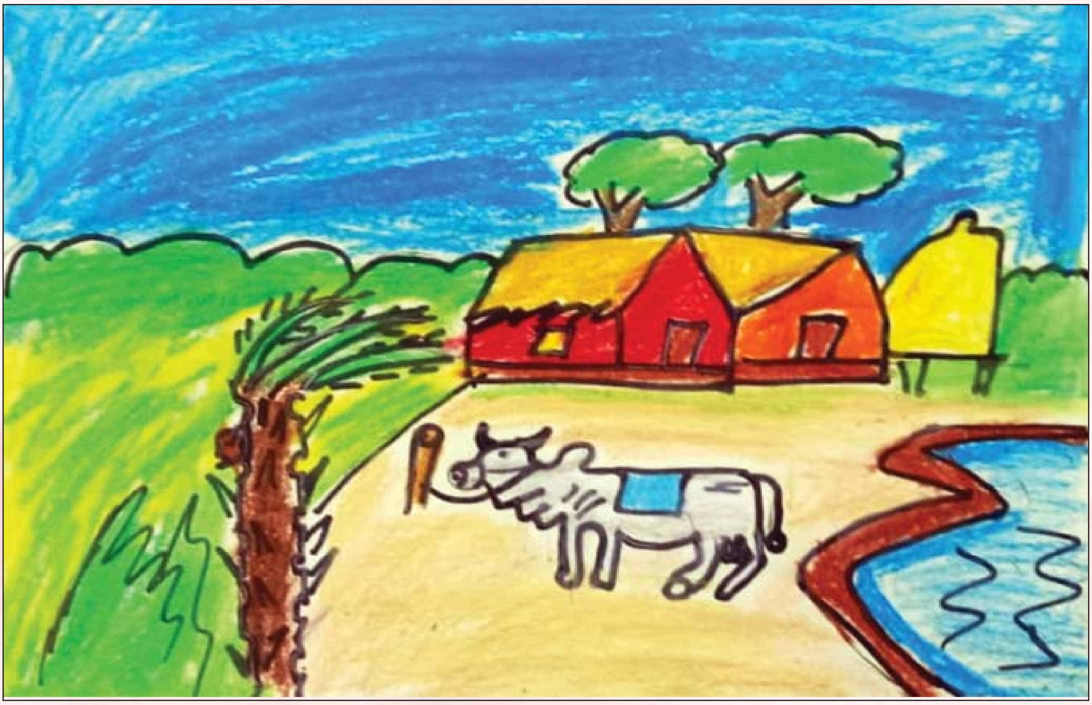

শাহারিয়া বারী, চতুর্থ শ্রেণি, সেন্ট গ্রেগরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

নাভিন আল রাজী, তৃতীয় শ্রেণি, ইংলিশ ভার্সন, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

ইশরাত ইয়াছিন ইরা, চতুর্থ শ্রেণি, সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গালর্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

সাদিয়া হোসেন মিম, দশম শ্রেণি, মডেল একাডেমি, মিরপুর-১, ঢাকা

মীর্জা মাহের আসেফ, ষষ্ঠ শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-49, No-04. October 2024, Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

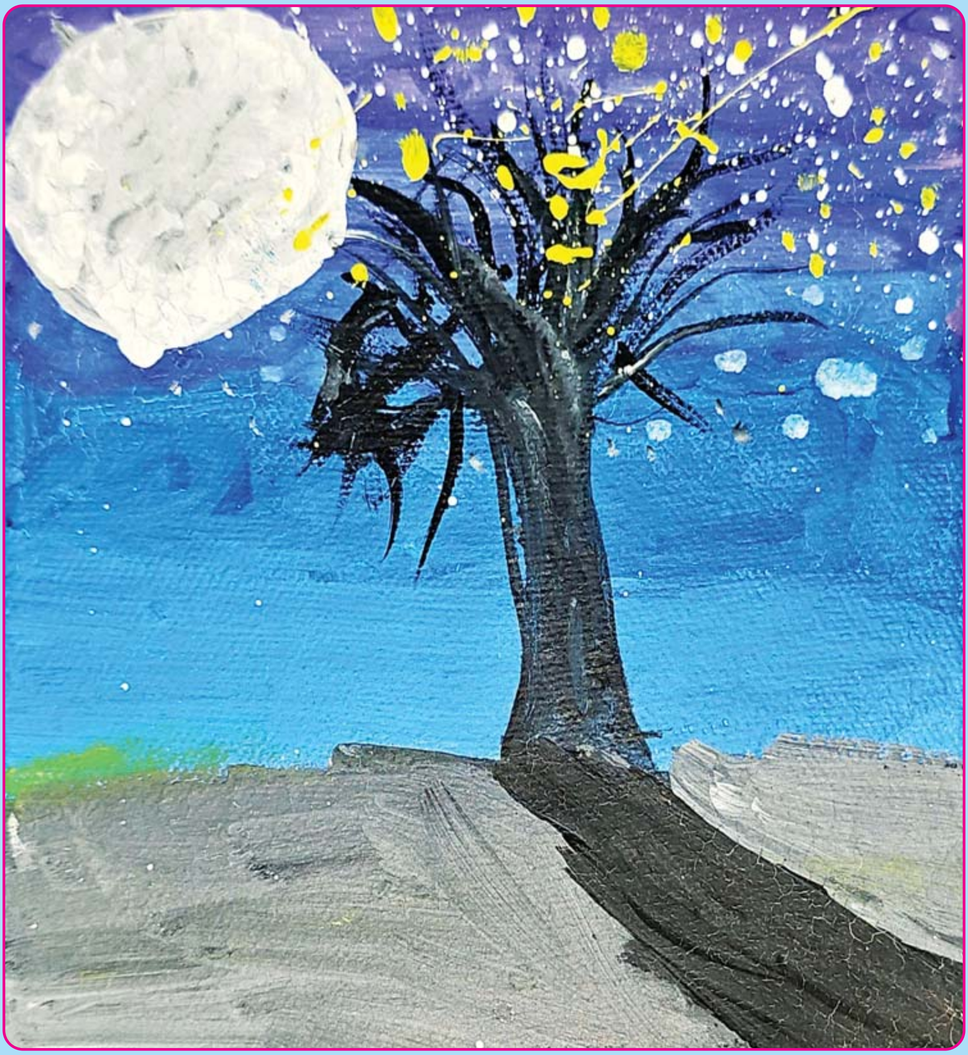

আফনান তারীফ আহমেদ, ষষ্ঠ শ্রেণি, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা